দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
— পৃঃ ১১

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ একটি আন্দোলনের ১০০ বছর
— পৃ : ২২

৬৮ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ৭ মার্চ ২০১৬।। ২৩ ফাল্গুন - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

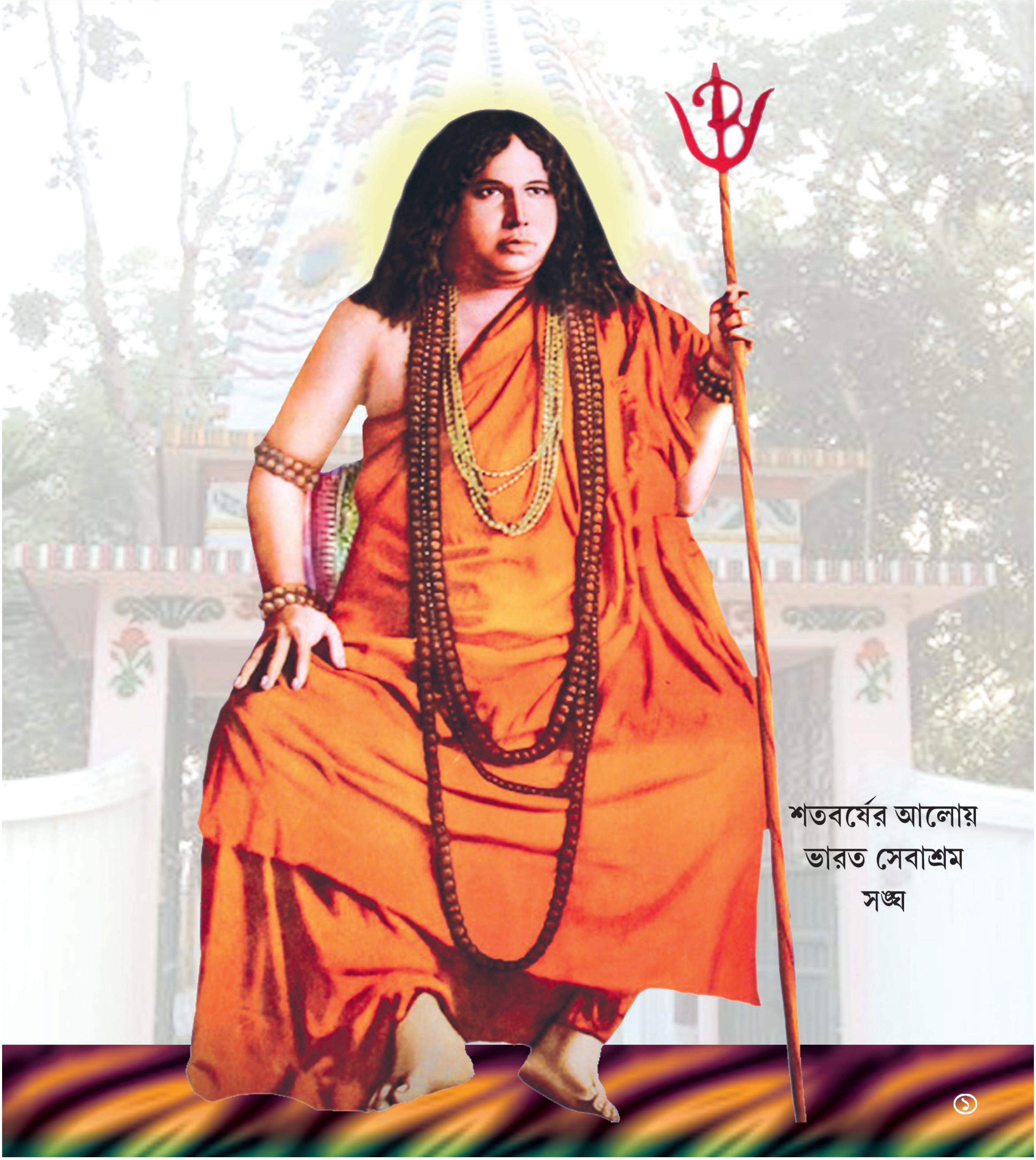

শতবর্ষের আলোয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ২৩ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৭ মার্চ - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

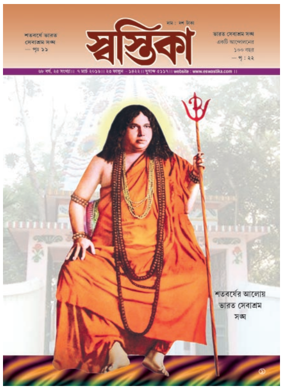

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

খোলা চিঠি : একদিনে ৩০০ শিলান্যাস, দিদিকে কেউ 'শিলাদি' বলবেন না প্লিজ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কমিউনিস্টদের খুনের রাজনীতি বাংলার মানুষ ভোলেনি □ গূঢ়পুরুষ □ ৮

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে আমি গর্বিত □ জিষ্ণু বসু □ ৯

শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ □ স্বামী যুক্তানন্দ □ ১১

সাক্ষাৎকার : হিন্দু সমাজের সাধু-সন্ন্যাসী ও গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের দেশাত্মবোধের কথা, সংগঠিত হওয়ার কথা বললে হিন্দুদের কোনো সমস্যা হতো না : স্বামী প্রদীপ্তানন্দ □ ১৯

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ : একটি আন্দোলনের ১০০ বছর □ শিলাদিত্য ঘোষ □ ২২

হিন্দুর প্রাণকেন্দ্র বারাণসী— কিছু কথা, কিছু ব্যথা □ স্বামী ব্রহ্মময়ানন্দ □ ২৫

দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে (১৯৪৩-৪৪) ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ □ ড. সুব্রত বিশ্বাস □ ২৭

শতবর্ষের আলোয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ □ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩১

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিনই যুক্তি তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ ছিল না □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৩৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৩৭-৩৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

অসহিষ্ণুতার ঝড় তুলে রাজনৈতিক ফায়দা

দাদরি, রোহিত ভেমুলা, জে এন ইউ— একটার পর একটা ঘটনা নিয়ে অসহিষ্ণুতার জিগির তোলা হচ্ছে। অথচ কালিয়াচকের মতো এত বড় কাণ্ড নিয়ে টুঁ শব্দ নেই। মুসলমানদের তোয়াজ করতেই অসহিষ্ণুতার ঝড় তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কংগ্রেস আর কমিউনিস্টরা। এই বিষয়েই আলোকপাত করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক রমানাথ রায় ও ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ।

।। দাম একই থাকছে ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সহ্যেরও সীমা রহিয়াছে

জে এন ইউ ইস্যু লইয়া বিজেপি সরকার বিতর্কে রাজি হওয়ায় কংগ্রেস বিপাকে পড়িয়াছে। কংগ্রেস ভাবিয়াছিল এই ইস্যু লইয়া সরকার সংসদে বিতর্কে রাজি হইবে না। আফজল গুরুকে শহিদ হিসাবে তুলিয়া ধরিতে আগ্রহী জে এন ইউ আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী। যদিও কংগ্রেস আমলেই সংসদ ভবনে হামলাকারী আফজল গুরুকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারেই ফাঁসিতে ঝোলানো হইয়াছিল। কিন্তু রাহুল গান্ধী এই বিতর্কে সংসদে মুখ খুলিলেন না। তাঁহার অপরিপক্বতা আরও একবার প্রমাণিত হইল। আবার ইশরত জাহান বিতর্ক মামলাতেও কংগ্রেসের মুখ পুড়িয়াছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন গৃহসচিব পি কে পিল্লাই এবং 'র'-এর প্রাক্তন স্পেশাল ডিরেক্টর রাজেন্দ্র কুমার এক সুরে বলিয়াছেন, ইশরত নামের মেয়েটি লস্কর জঙ্গি ছিল। কিন্তু মোদী সরকারের বদনাম করিবার জন্য পূর্বতন কংগ্রেস সরকার ইশরতের জঙ্গি সংযোগের বিষয়টি গোপন রাখিয়াছিল। অর্থাৎ কংগ্রেসের এই অভিযোগটি যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল তাহা এখন স্পষ্ট। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের হাতে কোনো ইস্যু নাই। যাহা পাইতেছে তাহাই ধরিয়া রাজনীতির অঙ্গনে ভাসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে।

এখন আবার মহিষাসুর ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া স্মৃতি ইরানির নামে 'প্রিভিলেজ নোটিশ' বা বিশেষাধিকার ভঙ্গের নোটিশ জারি করিয়াছে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। জে এন ইউ বিতর্কের জবাব দিতে যাইয়া কেন্দ্রীয় মানব সম্পদমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মহিষাসুরের প্রসঙ্গ তথ্য প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। জে এন ইউ-তে গত চার পাঁচ বছর ধরিয়া মহিষাসুরের শহিদ দিবস পালিত হইতেছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। এই শহিদ দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজকরা যে প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহা তিনি সংসদে হুবহু তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাতে মা দুর্গা সম্পর্কে অতি আপত্তিজনক অপমানজনক মন্তব্য ছিল। এই প্রচারপত্র সংসদে তুলিয়া ধরিবার সময় স্মৃতি ইরানি নিজের খেদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছেন, তিনি নিজে একজন হিন্দু। মা দুর্গার পূজা করেন। এরপরও কংগ্রেস স্মৃতিকে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করিবার জন্য কাঠগড়ায় তুলিয়াছে। ইহাকেই বোধ হয় বলে 'চোরের মায়ের বড় গলা'।

২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভা টিভি-তে এই ঘটনার যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁহারা দেখিয়াছেন মা দুর্গার উপাসিকা হিসাবে তিনি কী ধরনের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। প্রশ্ন হইল, মহিষাসুরকে মর্যাদা দিতে যাইয়া কোটি কোটি মানুষের আরাধ্যাদেবী দুর্গাকে অপমান কেন? ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন ধারায় পড়ে এই ধরনের কুৎসা প্রচারের অধিকার? মহিষাসুর শহিদ দিবস পালনের অনুষ্ঠানকে কংগ্রেস কি সমর্থন করিতেছে? যদি করিয়া থাকে তাহলে স্মৃতি কি কোনো অন্যায় করিয়াছেন? আর বামপন্থীরা যাঁহারা ধর্মকে আফিম মনে করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারা কীভাবে মহিষাসুরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবেন? সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি যখন বিষয়টিকে লঘু করিবার জন্য বাংলা ভাষায় কিছু বলিতেছিলেন তখন বাংলা ভাষাতেই স্মৃতি ইরানি যেভাবে তাঁহার সহিত বাগযুদ্ধে লিপ্ত হন তাহাতে তিনি চুপ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। স্মৃতি যখন অভিযোগ করেন—দলিতরা এখন বিরোধীদের খাদ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহাদের আর কিছু বলার থাকে না। বিরোধীদের আচরণকে শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের সেই উক্তিটির সহিত তিনি তুলনা করিয়াছেন যেখানে বলা হইয়াছে—'ফেয়ার ইজ ফাউল, ফাউল ইজ ফেয়ার।'

মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কোটি কোটি হিন্দুর আরাধ্য দেবীকে অপমান কোনো ভাবেই সহ্য করা যায় না। তাই তাহাদের শুধুমাত্র দেশদ্রোহী বলাই যথেষ্ট নয়, কঠোরতম শাস্তিও প্রাপ্য।

সুভাষিতম্

অগ্রতো চতুরো বেদাঃ পৃষ্ঠতো সশরো ধনুঃ।
ইদং শস্ত্রং ইদং শাস্ত্রং শাপাদপি শরাদপি।।

সামনে চারটি বেদ রয়েছে এবং পিঠে তির-ধনুক ধারণ করেছি। অর্থাৎ শস্ত্র এবং শাস্ত্র দুটোই আছে। তোমাকে শস্ত্র দিয়ে অথবা শাস্ত্র দিয়ে পরাজিত করবো।

A Well Wisher

একদিনে ৩০০ শিলান্যাস, দিদিকে কেউ ‘শিলাদি’ বলবেন না প্লিজ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

সামনেই ভোট। তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। আপনারাও তৈরি হন। দ্বিতীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে ক্ষমতায় আনতেই হবে। এই সরকারই ভারতের শ্রেষ্ঠ সরকার। অতীতে এমন সরকার ক্ষমতায় আসেনি। ভবিষ্যতেও আসবে না। বাংলাকে তিনি বিশ্ববাংলা করেছেন। তিনিই দেখিয়েছেন যে কোনো কাজে সেঞ্চুরি করাটা কত সহজ।

ক্ষমতায় আসার মাস ছয়েকের মধ্যেই তিনি বলতে শুরু করেন, সরকার ১০০ শতাংশ কাজ করে ফেলেছে। এর পরে ১০০ থেকে এগোনো যায় না বলে প্রতিবারই তিনি বলে গিয়েছেন ১০০ শতাংশ কমপ্লিট। এখন যা হচ্ছে সব একস্ট্রা রান।

এই পাঁচ বছরে তিনি একের পর এক ক্যাচ তুলেছেন। যাতে তিনি আউট হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু বিরোধীরা ঠিক মতো ফিল্ডিং সাজাতেই পারেনি। তাই তো তিনি ৩০০ নট-আউট।

রানটা কী করে হলো বুঝতে পারছেন না তো! তবে বলেই দিই।

গত প্রায় পাঁচ বছরে একশো শতাংশের বেশি কাজ হয়ে গিয়েছে বলে অনেকবার দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই একের পর এক ‘সেঞ্চুরি’তেই মানুষ হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তার উপরে আবার একটি ‘ট্রিপল সেঞ্চুরি’র কৃতিত্বও সরকারের মুকুটে শোভা পেল। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের তিনশোটি প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। সামনে ভোট তো তাই একটা একটা করে করা গেল না। সময় কম।

শিলার ’পরে শিলা দিয়েই তো রামায়ণে সাগরবন্ধন সম্ভব হয়েছিল। জলে ভাসে শিলা। রাজনীতিতে ভাসে শিলান্যাস। শিলান্যাসের পর শিলান্যাস দিয়েই তো একদিন এ রাজ্যে উন্নয়নের সেতুবন্ধন সম্ভব হবে। সম্ভব হবে অনুন্নয়নের অশোকবনে বন্দিনী রাজ্যলক্ষ্মীকে উদ্ধার করা। তখন শ্রী ও সৌন্দর্যে ভরে উঠবে বিশ্ববাংলা। অপরিমেয় কল্যাণের মধ্যে দিনাতিপাত করবে বাংলার মা-মাটি-মানুষ।

কলকাতা লন্ডনই হইবে এই শিলান্যাসের মধ্য দিয়েই।

শিলায় শ্যাওলা পরলে সেসব দেখাতে পর্যটন প্রকল্পের শিলান্যাস হবে। শিলা বানানোর জন্য রাজ্য সরকারের বরাত যে সব সংস্থা পায় তারা এই বছরটার গোড়া থেকে দম ফেলার সময় পায়নি। এবার শান্তি মিলবে। ছুটি হবে। কটা দিনের। ভোট মিটলে কিছুদিন বন্ধ থাকবে কাজ। তবে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। ২০১৯-এ লোকসভা ভোট আছে। তার আগে পঞ্চায়েত ভোট আছে। সুতরাং, শিলা শিল্প জমবেই জমবে।

কেন সরকার মানুষের মঙ্গলের জন্য এত প্রকল্প বানাতে ব্যাকুল! কারণটি আদি ও অকৃত্রিম। ভোটকে পাখির চোখ করেই সরকার নানারকম কর্মসূচি পালনে ব্রতী হয় এবং হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীরা একের পর এক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই শিলান্যাসের হিসেব দিয়েই তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর কেমন উন্নয়ন করা হয়েছে, কেমনভাবে তব ভুবনে, তব ভবনে আরও-আরও-আরও প্রাণ-ত্রাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ও হবে— ইত্যাকার নানাবিধ পরিসংখ্যান-তথ্যপ্রমাণ দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে জোরদার প্রচার-কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে। সরকার ধনুকভাঙা পণ করেছে, মানুষকে তারা ‘উন্নয়ন’ চেনাবেই চেনাবে! ফলে ভোটের মাহেন্দ্রযোগ-অমৃতযোগ উদয় হওয়ার পূর্বেই তারা আনুষঙ্গিক সব আয়োজন সেরে ফেলতে চাইছে!

রাজ্যের কপালে এভাবে শিলা-লিপি খচিত-রচিত হওয়ার কথা নয়। একটি সরকার তার রাজ্য বা দেশের জন্য কী করছে, সেই খতিয়ান তারই তুলে ধরার বিশেষ বাধ্যবাধকতা নেই। যে সময়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ হোত, তখন মানুষকে জানানোর জন্য কোনো তৃতীয় মাধ্যম উপস্থিত ছিল না। তাছাড়া এভাবে প্রচার-কর্মসূচি পালনের খুব যৌক্তিকতাও নেই। উন্নয়ন একটা অভ্যাস। সেই অভ্যাসের মধ্যে থাকা মানে, উন্নয়নের শরিক হওয়া। উন্নয়নের শরিক হতে না-পারলে নিছক শিলান্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাসের বাহুল্য নিয়ে সাধারণ মানুষের লাভ নেই। যা মানুষের কাছে স্পর্শযোগ্য করে তোলা হচ্ছে, সেটার অস্তিত্বই আছে কি না, জল্পনা তা নিয়েও। উন্নয়ন কি তবে নিছক কল্পনা!

এসব কুটিল প্রশ্নে মন দেবেন না পাঠক-পাঠিকারা। প্লিজ ভাবুন দিদি আর কিছু না পারুন, কথাশিল্প এবং শিলাশিল্প নিয়ে যথেষ্ট ভাবিত এবং উদ্যোগী। সেটা তিনি একটুও ফাঁকি না দিয়ে করে চলেছেন। ভোটের পর আগে শিলা নয় আপাতত কথাশিল্পই চলবে। তবে দোহাই আপনাদের, দিদি এত শিলান্যাস করছেন বলে কেউ দিদিকে আড়ালে ‘শিলাদি’ বলে ডাকবেন না যেন।

— **সুন্দর মৌলিক**

কমিউনিস্টদের খুনের রাজনীতি বাংলার মানুষ ভোলেনি

রাজ্য রাজনীতিতে নির্বাচনী তরজার আসর জমে উঠেছে। সম্ভবত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পাঁচ বা সাত দফায় ভোট নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের মতে পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন করানো সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ এই রাজ্যে সব রাজনৈতিক দলই কম বেশি লুম্পেন রাজনীতি করে। ভোটে জিততে গুন্ডাদের কাজে লাগায়। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে টানা এই গুণ্ডা রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে চলছে। প্রয়াত জ্যোতি বসু এই সংস্কৃতির মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন। এই রাজ্যে ভদ্রবেশী কমিউনিস্টরা কোনোদিনই জনসমর্থনে ভোটে জেতেনি। বাম রাজত্বে হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছেন কমিউনিস্টদের হাতে স্রেফ ভোটের সময় গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য। কমিউনিস্টদের খুনের রাজনীতি বাংলার মানুষ ভোলেননি।

কমিউনিস্টদের পোষা সেই গুণ্ডারা এখন তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় বাস করছে। তৃণমূল প্রার্থীদের ভোটে জেতাতে এরা অবশ্যই ঝাঁপাবে। গত পাঁচ বছরে এই লুম্পেন গুণ্ডারা তাদের প্রাক্তন প্রভু কমিউনিস্টদের বিষ দাঁত ঠেঙিয়ে ভেঙে দিয়েছে। বিষহীন ঢোঁড়া সাপের দল আত্মরক্ষার্থে এখন ছয় পার্সেন্ট ভোট পাওয়া কংগ্রেসকে জোটসঙ্গী করতে চাইছে। এতে বামেরা লাভবান হবে অথবা রাজ্য কংগ্রেস— সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে জোট করলে তৃণমূলের ঠ্যাঙাড়েদের হাতে আড়ং ধোলাইটা কম হবে এটাই আলিমুদ্দিন এবং প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বিধানসভার ১১০টি আসনে প্রার্থী দিতে চাইছেন। এই অবাস্তব দাবির লক্ষ্যটা হচ্ছে সিপিএমকে প্যাঁচে ফেলা। হাতি কাদায় পড়ে ডুবছে দেখলে ব্যাঙেও তাকে লাথি মারে। রাজ্য কংগ্রেসের ৫০টি আসনেও প্রার্থী দেওয়ার রাজনৈতিক শক্তি নেই। অধীরবাবুর কাছে তাঁর জেলা মুর্শিদাবাদের গড় রক্ষা করাটাই মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর পক্ষে সারা রাজ্যের প্রার্থীদের সাহায্য করাটা সম্ভব নয়। আলিমুদ্দিন থেকে বিমানবাবুরা জানতে চেয়েছিলেন যে ১১০ জন প্রার্থী তিনি খুঁজে পাবেন না। জবাবে অধীরবাবু বলেছেন, একক

গূঢ় পুরুষের কলম

শক্তিতে লড়লে ১১০ জন প্রার্থী পেতেন না। জোট হলে জেতার আশায় অনেকেই প্রার্থী হওয়ার লাইনে দাঁড়াবে। এটা এক ধরনের রাজনৈতিক কৌশল। জোটের প্রধান শরিককে চাপে রাখার কৌশল। অধীরবাবু জানেন ১১০টি আসন চাইলে সিপিএম বড়জোর ৮০টি আসন দিয়ে রক্ষা করবে। দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেস একক শক্তিতে দুটি বা তিনটি আসনের বেশি জিতবে না। কমিউনিস্টদের কাঁধে বন্দুক রেখে চার পাঁচটি আসন পেয়ে গেলে লাভ বই লোকসান নেই। জোট করলে কংগ্রেসের লাভটাই বেশি। ক্ষতিটা সিপিএমের।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের জোট নিয়ে যে চিন্তিত তা তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি সংবাদমাধ্যমের একাংশের উপর জোট রাজনীতির দায় চাপিয়েছেন। কলকাতার একটি বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মালিকদের তৃণমূল বিরোধীদের চক্রান্তের হোতা বলেছেন। যাতে রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিকরাই তৃণমূল বিরোধী নয় এই বার্তা দিতে। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেন যে সরকারি পরিচয়পত্র আছে এমন কর্মরত রিপোর্টাররা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। ভালো কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর শুকনো প্রতিশ্রুতিতে সুবিধা পাওয়া যাবে না। এর জন্য নিয়মমাফিক গভর্নমেন্ট অর্ডার বা গেজেট নোটিফিকেশন প্রয়োজন। যা হয়নি। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল খুলে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো হাসপাতালেই চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামোই নেই। যদি থাকতো তবে জটিল রোগের ক্ষেত্রে এইসব তথাকথিত সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেই চিকিৎসা সম্ভব হোত। কলকাতার সরকারি হাসপাতালে কেস রেফার করতে হোত না। মমতা প্রায়ই দাবি করেন তিনি ১০০ বছরের উন্নয়নের কাজ পাঁচ বছরেই করে দিয়েছেন। এই সব অসত্য কথার নড়বড়ে ভিতের উপর দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রী নির্বাচনে বাংলার মানুষের মন জয় করতে চাইছেন।

আসন্ন নির্বাচনে সিপিএম-কংগ্রেস জোট তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তৃণমূলের প্রধান কাঁটা বিক্ষুব্ধ তৃণমূল। দক্ষিণবঙ্গের ৯০ শতাংশ আসনে এই বিক্ষুব্ধদের গোঁজ প্রার্থী থাকবে সে কথা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। নেত্রী তাঁর দলীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পরেই দক্ষিণবঙ্গজুড়ে খুনের রাজনীতি শুরু হয়ে যাবে। সিপিএমের যে গুণ্ডা লুম্পেনরা এখন তৃণমূল করছে তারাই বোমা পিস্তল নিয়ে তখন তৃণমূল প্রার্থীদের তাড়া করবে। জেলায় নেতাদের পাত্তা না দিয়ে দিদি যে একাই কলকাতায় বসে প্রার্থী চাপিয়ে দেবেন তা জেলা নেতৃত্বের বশংবদ গুণ্ডাবাহিনী মেনে নেবে না। এবার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে লাগামছাড়া মারদাঙ্গা হবেই। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি প্রার্থী সমর্থকরাও রেহাই পাবে না। তৃণমূল লুম্পেনদের খুনের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ▮

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে আমি গর্বিত!

জিষ্ণু বসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সবুজ মাঠটার একদিকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র হিসাবে ঢোকা থেকে মাঠের অপর প্রান্তে প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে পিএইচডি। মাঝখানে অনেকগুলো বছর। প্রযুক্তিবিদ্যার অসাধারণ পণ্ডিত শিক্ষকদের কাছে আমার সুযোগ যেমন হয়েছে তেমন পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে জানবার, বিশ্লেষণের আগ্রহ, ভালোবাসা জাগিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ। জীবনের সবচেয়ে বেশি প্রাণোচ্ছল সময়টা এই জে ইউ ক্যাম্পাসেই কেটে গেল— অরবিন্দ ভবন, ব্লু আর্থ ওয়ার্কশপ, ক্যান্টিনগুলো আর ঝিলপারে। এমনকী জীবন সঙ্গিনীটিকেও আশীর্বাদ হিসাবে দিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাই আমার মতো অনেকের কাছেই যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার্জনের তীর্থক্ষেত্র, যৌবনের উপবন আর গভীর আশার আশ্রয়স্থল।

আজ যাদবপুর ক্যাম্পাসে ঘটে চলা দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপ, ছাত্রছাত্রীদের অশালীন, ঘৃণিত নিষ্ঠুর ব্যবহার আর সেইসঙ্গে ক্ষুদ্র সাময়িক স্বার্থের তাগিদে মুষ্টিমেয় অধ্যাপকের প্রকাশ্য সমর্থন পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। মানুষ আশ্চর্য হয়ে দেখছে, কোটি কোটি আধপেটা খাওয়া গরিব মানুষের টাকায় মহানন্দে লালিত তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগুলো এত নিষ্ঠুর, এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে? এটাই কি যাদবপুরের আসল চেহারা?

না! বরং উল্টোটাই সত্যি। একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই যাদবপুর জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বজা উঁচু করে ধরে রেখেছে। আজকের এই জাতীয়তা-বিরোধী স্লোগান, প্রকাশ্য চুম্বন, মহিলাদের সেনেটারি ন্যাপকিনে পোস্টার এসব দেখে মেকলে সাহেবের সেই কথাগুলো আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে। এক শ্রেণীর ভারতবাসী যারা রক্তে ও গাত্রবর্ণে ভারতীয় হবে কিন্তু চিন্তা ভাবনায় হবে পুরোপুরি বিদেশি।

মেকলের শিক্ষাব্যবস্থার এই দুরভিসন্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেই জন্ম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীরা তৈরি করেছিলেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন। আর তারকনাথ পালিতের হাতে সৃষ্টি হলো বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট। আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই দুই প্রতিষ্ঠানের সমাহিত রূপ। তাই ভারতীয়ত্বের জন্য লড়াইটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই।

সত্তরের দশকেও নকশালদের চরম দেশদ্রোহিতার কাছেও মাথা নোয়ায়নি যাদবপুর। রাজ্যজুড়ে চলা ওই অরাজকতার ঝড়েও বটগাছের মতো দাঁড়িয়েছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক মানুষ। অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রদরদি মাস্টারমশাই। ১৯৭০ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁকে একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি দেবার পরেও তিনি বলেছিলেন, 'পরীক্ষা হবেই!' তাই তাকে খুন হতে হলো। আজকের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে পড়ন্ত বিকালে পেছন থেকে ছুরি মেরে পালিয়েছিল একজন অতিবাম ছাত্রনেতা— রানা বসু। প্রাণ দিলেন গোপালচন্দ্র সেন। কিন্তু আজকের দেশদ্রোহী ছাত্রসংগঠনগুলির জেনে রাখা প্রয়োজন যে তাদের পূর্বসূরীরা সেদিন জেতেনি, রানা বসুরা হেরেছিল। জিতেছিলেন অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন। প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা বন্ধ হতে দেননি। আর সেই রানা বসু কী করেছিল? চীনের চেয়ারম্যান যাদের চেয়ারম্যান ছিল, শত শহীদের রক্তে আসা ভারতের স্বাধীনতা যাদের কাছে 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' ছিল? রানা কানাডায় পালিয়ে গিয়েছিল। ধনী ডাক্তার বাবার টাকায় উচ্চশিক্ষা নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনমুলুকে জীবন অতিবাহিত করেছিল পরমানন্দে।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। বিগত তিন দশক ধরে যাদবপুরের অতিবাম ছাত্রনেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিপ্লবের নামে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাত্রছাত্রীদের শতকরা নব্বই ভাগের উত্তরজীবন রানা বসুর সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। বিগত তিরিশ চল্লিশ বছরের ডি এস এফ, ইউ এস ডি এফ-এর অফিস বেয়ারারদের তালিকা মিলিয়ে দেখুন, এরা পরবর্তী জীবনে দেশের নিরন্ন মানুষদের জন্য, নির্যাতিত, অবহেলিতদের জন্য কোনো স্বার্থত্যাগ করেনি। তৈরি হয়েছে এক একজন রানা বসু। রাজপরিবারের ছেলেরা যেমন যৌবনে মৃগয়া করে, ছাত্রজীবনের ওই সময়টা তারা অতিবাম আন্দোলনের অ্যাডভেঞ্চার এনজয় করেছে মাত্র।

আর বাকি দশভাগ অতিবাম ছাত্রনেতা? তারা? তারা প্রথমত, প্রথম শ্রেণীর নব্বই ভাগের যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খল কাজের সমর্থন করেছে। যেমন যাদবপুরে অমানবিক র‍্যাগিং-এর বিরুদ্ধে এইসব অতিবাম ছাত্রসংগঠন কখনো কোনো ভূমিকা নেয়নি। কারণ তারা রাজপুত্রদের মৃগয়ায় বাধা হতে চায়নি। ঠিক তেমনই দলিত সম্প্রদায়ের প্রায় কোনো প্রতিনিধিত্বই এদের মধ্যে দেখা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদেয় বেতন অতি সামান্য। দেশের গরিব মানুষের টাকায় বছরের পর বছর প্রতিপালিত হয়েছে এই রাজপুত্রদের মৃগয়া ব্রিগেড। তাতে ওই আগমার্কা নেতাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কারণ, রাত্রে বিদেশি স্কচ হুইস্কি খেয়ে, সকালে এরাই 'দুধ পিয়া তো হামলা বোল', বলে ভিড় বাড়াতো।

এই আগমার্কা নেতাদের কিছু অংশ এখনো হয়তো সশস্ত্র বিপ্লবের খোয়াব

দেখেন। তাদের কাছে ‘হিন্দুস্থানের বরবাদি’ই হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাই দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার, অগোছালো রাষ্ট্র ব্যবস্থা এদের একান্ত কাম্য। এই ভাবনাই তাদের ইসলামি জেহাদিদের কাছে এনেছে। কারণ দুই দলেরই লক্ষ্য এলাকাভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন। রেডিও কন্ট্রোল্ড এবং ভয়েস একটিভেটেড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস মাওবাদীরা তালিবানের কাছ থেকে কাশ্মীরি জঙ্গিদের মাধ্যমে পেয়েছে (টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ডিসেম্বর ৪, ২০১০)। এই প্রযুক্তি আদান প্রদানের কাজে মাওবাদীদের অন্যতম সহায়ক যাদবপুরের এই ছাত্রচক্র। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে ইউনাইটেড স্টুডেন্টস ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউ এস ডি এফের নাম। (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ডিসেম্বর ১৫, ২০১০)।

আর এই আগমার্কা নেতাদের অতি সামান্য অংশ এইসব বিপ্লবের পিছনের রহস্যটাও জানে। একটা টু স্টেজ ল্যান্ডমাইন ফাটাতে গড়ে খরচ ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া এই ল্যান্ডমাইনগুলির প্রতিটিই চীনে তৈরি। ওই টাকায় মাইন না ফাটিয়ে জঙ্গলমহলের একটি গ্রামকে এক সপ্তাহ পেট ভরে দুবেলা খাওয়ানো যায়। এক কিলোমিটার জাতীয় সড়ক তৈরির খরচ বর্তমানে কমবেশি এককোটি টাকা। অনুন্নত একটি এলাকায় রাস্তা কেটে দেওয়ার অর্থ সেখানের খাদ্য সরবরাহের শৃঙ্খল বহু দিনের জন্য নষ্ট করা। ভারতে জেহাদিদের কাছ থেকে পাওয়া বেশিরভাগ অস্ত্রশস্ত্রই চীনে প্রস্তুত। ভারতবর্ষের গরিব মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের জন্য যে চীন বা পাকিস্তান একযোগে এত টাকা খরচ করছে না, সেটা তারা বিলক্ষণ জানে। তথাকথিত ছাত্র আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা এইসব হাতে গোনা কয়েকজনই করে। আর রাজপুত্রদের মৃগয়া ব্রিগেডকে দক্ষ বাজিকরের মতো নাচায়।

বাইরে থেকে মনে হয় এটাই যাদবপুর। কিন্তু এর মধ্যে আছে আরেকটা যাদবপুর। গরিব, মধ্যবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসা, হৃদয়বান ছেলে, অনুভবী মেয়ে সে সংখ্যাটা ওইসব উগ্র দেশবিরোধীদের থেকে অনেক অনেক বেশি। তারাই মূল যাদবপুর। তাদের নিরলস বিদ্যাসাধনাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মান ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষা জগতে, শিল্পক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল এমন বিরাট মনের মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়, তাদের যাদবপুরের প্রাক্তনী জেনে বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। যাদবপুরের এই মহতীরূপটা খবরের কাগজে, প্রচার মাধ্যমে আসে না। তার কারণ আজকের প্রচারমাধ্যম ‘নিউজ’ চায়। ওই রাজপুত্রদের মৃগয়া বাহিনীর ‘ন্যুইসেন্স ভ্যালু’ প্রচারমাধ্যমের কাছে নিউজ। আসল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কোনো নিউজ নয়। যেমন, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষের সময় যাদবপুর ক্যাম্পাসে এই অতিবাম ছাত্রগোষ্ঠী স্বামীজীর ছবি, পোস্টার, ছিঁড়ে পা দিয়ে দলে পিষেছিল। প্রচারমাধ্যম সেটা দুনিয়াকে দেখিয়েছে। কিন্তু যাদবপুরেই যে বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যথাক্রমে প্রোডাকসান ইঞ্জিনিয়ারিং এবং দর্শন বিভাগে এক দীর্ঘকালীন সমাজসেবামূলক প্রকল্প চলেছিল, সে খবর প্রকাশ পায়নি। অথচ এই দু’টি প্রকল্পই ছিল একেবারে অভিনব ও গঠনমূলক। স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমার ১০০ বছর পূর্তিতে কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ কেন্দ্র ভারতব্যাপী যাত্রার আয়োজন করেছিল। আয়োজকদের খুব ইচ্ছা ছিল এই যাত্রা ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শুরু হোক। কিন্তু বাম ছাত্রসংগঠনের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিন্তু যাত্রা নির্বিঘ্নে যাদবপুরের অরবিন্দ ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়েছিল। এসব কথা যদি খবরে আসত তবে হয়তো আসল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে মানুষ চিনত।

বর্তমানে কিছু অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের এই অরাজকতার সমর্থনে ভূমিকাটাও বেশ হাস্যকর। যারা আজকের ছাত্রদের কাশ্মীরের উগ্রপন্থী বা আফজল গুরুদের সমর্থনে জেহাদকে প্রকাশ্যে বাহবা দিচ্ছেন তাঁরা মূলত সিপিআই(এম) দলের নেতানেত্রী। কয়েকজন বিভিন্ন নির্বাচনেও প্রার্থী হয়েছেন। মজার ব্যাপারটা হলো, এই সিপিআই(এম) দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই অতিবাম ছাত্রসংগঠনের সমর্থকদের বিভিন্ন অছিলায় বেধড়ক পেটাতো। ১৯৯৩ সালে ক্লাসটেস্টের দাবিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকল্টির ছাত্ররা অনশন করছিল। রাত সাড়ে নটা নাগাদ তৎকালীন ক্ষমতাশীল দল বাইরে থেকে লোকজন এনে ছেলেমেয়েদের টেনেহিঁচড়ে, ভীষণ মারধর করে উঠিয়ে দেয়। পরেরদিন ডিএমএফ-সহ অতিবাম ছাত্রসংগঠনগুলি রাজ্যপালের কাছে মিছিল করে বিচার চাইতে যায়।

আজ সময় বদলে গেছে। সিপিআই এম আজ নখদন্তহীন লোলচর্ম বৃদ্ধ বাঘ। দু’টো সোনার বালা নিয়ে সহজ শিকারের প্রতীক্ষা করছে। আজ যাদবপুরের অতিবামের সমর্থনে প্রথমে বাম অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আর পরে মূল বামফ্রন্টের পথে নামা দেখে হিতোপোদেশের সেই বৃদ্ধ বাঘের গল্পটাই মনে করিয়ে দিল। কিন্তু বাস্তবটা হলো এই ধরনের সুবিধামতো অবস্থান বদল করা অধ্যাপক অধ্যাপিকার সংখ্যাও যাদবপুরে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যাদবপুরের অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন, অমিতাভ ভট্টাচার্য, মধুসূদন ভট্টাচার্য, সীতানাথ গোস্বামীর মতো দৃঢ়চেতা মানুষ। যাঁরা বেতের মতো হাওয়ার দিকে ঢলে পড়েননি। এনারাই যাদবপুরের শিক্ষককুল। আজও এমন মানুষদের সামনে দাঁড়ালে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে। তাই দেশবিরোধীদের শত চেষ্টার পরেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের জাতীয়তাবাদী চরিত্র পাল্টাবে না। ২৪ ডিসেম্বর সকালে ছাত্র শিক্ষক সকলে গৈরিক উত্তরীয় পরে মুক্তমঞ্চে সমাবর্তনে উপস্থিত হবেন। ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে তপোবনের দীক্ষান্তমন্ত্র পাঠ করবে ছাত্রছাত্রীরা। দীক্ষান্তে ভাষণ দেবেন আচার্য। আর এই দেশবিরোধী কার্যকলাপ যারা করছে তাদের বড় অংশই রানা বসুর মতো ভোগবাদী জীবনে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দেশের দরিদ্র, নিরন্ন জনগণের দিকে, দলিত বঞ্চিত অবহেলিতদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। আর অতি সামান্য কয়েকজন জঙ্গলে জঙ্গলে অতৃপ্ত আত্মার মতো ঘুরবে। কবে চীন বা পাকিস্তান এদেশটা দখল করে তাদের হাতে তুলে দেবে। যেমনটা ঘটেছিল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে। ■

শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

স্বামী যুক্তানন্দ

শ্রীভগবান কথা দেন, কথা রাখেনও। তিনি তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কথা দিয়েছেন— যখন যখন ধর্মে গ্লানি আসবে, অধর্মের অভ্যুত্থান হবে, তখন তখনই আমি আবির্ভূত হব। আবির্ভূত হয়ে পরিত্রাণ করব সাধুদের, দুষ্টদের করব বিনাশ এবং ধর্মের পুনঃসংস্থাপন করব। শ্রীভগবান তাঁর ওই কথা যে ঠিক ঠিক মতই রক্ষা করেছেন, তার প্রমাণ আছে রামায়ণে, আছে মহাভারতে, আছে পুরাণে।

শ্রীভগবানের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার রক্ষার বিষয়ে প্রমাণ যে শুধু গীতাতেই রয়েছে তাই নয়, আছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। আছে শিব-পুরাণে বা অন্যত্রও।

তবে শ্রীভগবানের এই যে আসা, সেটি নির্ভর করে তিনি কখন আসবেন, কোন পরিস্থিতিতে আসবেন, কীভাবে আসবেন, কাদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন, কোন অস্ত্রে সজ্জিত হবেন বা হবেন না ইত্যাদিও। তাই দেখা যায়— কখনও তিনি আসেন পূর্ণাবতার রূপে, পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে। কখনও আসেন অংশাবতার হয়ে ইত্যাদি। আর তাঁর সে-ভাবেই আসার জন্য তিনি কখনও অভিহিত হন— আচার্য, কখনও অবতার, কখনও যুগাচার্য, কখনও যুগাবতার, কখনও অবধূত ইত্যাদি অভিধায়। কিন্তু যে অভিধায়ই তিনি অভিহিত হোন না কেন, প্রতিটিই সেই তাঁরই রূপ, তাঁরই লীলা। জগতের কল্যাণে, জগতের মঙ্গলে তাঁরই খেলা। তাঁরা কেউই ছোট নন। অনাদরের নন। প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকেই সমাদরের। আর তাঁরা যে-ভাবেই জগতে ধর্মকে, সংস্কৃতিকে, সমাজকে রক্ষা করেন। খোঁজ নিলে সব যুগেই হয়তো এমন তথ্যই পাওয়া যাবে।

বিগত সাতশো বছরের যে ইতিহাস, সে তো ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাস। হিন্দুর উপর অত্যাচারের ইতিহাস। সেই কঠিন ইতিহাসের যুগেও কিন্তু হিন্দুর ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষা পেয়েছে ওই ঈশ্বর পুরুষ বা ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষদেরই জন্য। তবে হ্যাঁ, তৎকালীন হিন্দু রাজা, জমিদার বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের যে সেক্ষেত্রে অবদান ছিল না, সহানুভূতি বা সহযোগিতা ছিল না, তা কিন্তু নয়। তাঁরাও তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন।

বিদেশি বিধর্মী অত্যাচারী ইসলামপন্থী বা খৃষ্টপন্থী শাসকদলের সময়ও হিন্দুর ভগবান, ভারতের ভগবান ঘুমিয়ে থাকেননি। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষায় বহু আচার্য, অবতার, যুগাচার্য, অবধূত ইত্যাদি নানারূপে এসে তাঁর শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম ধর্ম— হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছেন। এই যে আচার্য, অবতার, অবধূত বা যুগাচার্যরূপে যাঁরা হিন্দুর কল্যাণে তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণে জগতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তবে তিনিই সম্ভবত পরাধীন ভারতবর্ষের শেষ যুগাচার্য এবং তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার ব্যাপ্তি ছিল বৃহত্তম ক্ষেত্রের জন্য, সেকথা তাঁর জীবন ও কর্মলীলা প্রত্যক্ষ করলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব ইংরেজি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের বাজিতপুরে। অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয়েছিল বিদেশি শক্তি ইংরেজদের এদেশ থেকে বিদায়ের শেষ লগ্নে, প্রায় একান্ন বছর আগে। তাঁর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়েছে। তারা ইংরেজ বিরোধী প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরন্তু যে হিন্দুজাতি দীর্ঘদিন পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ছিল, অত্যাচারিত হয়েছিল, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণের কৃপা, করুণা ও পরিশ্রমে রক্ষা পেয়েছিল, তারাও যেন আবার জেগে উঠতে চাইছিল, আত্মপ্রকাশ করতে চাইছিল। শুধু তাই নয়, হিন্দু যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট ছিল, সেখান থেকেও মুক্ত হয়ে বৃহত্তম হিন্দুজাতিরূপে নিজের স্বরূপটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাবের পর থেকেই। অবশ্য তাঁর জন্মের প্রাক্ লগ্নে হিন্দু-হৃদয়ের সম্রাট স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্বধর্ম-সভায় হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে পুনরায় হিন্দু জাগরণের শুভ উদ্বোধনের কাজটি করে দিয়েছিলেন। তাঁর গর্বভরে বলো--- 'আমি হিন্দু' কথাটি হিন্দুত্বপ্রাণ ভারতবাসীর মনে অবশ্যই নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন বিশ্বধর্ম-সভায় হিন্দুধর্মের জয়ডঙ্কা বাজান, তখন স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাবই হয়নি এবং জন্মের পরবর্তী বহুদিন যাবৎ তাঁর কাছে সেই বার্তা পৌঁছানোরও কথা নয়। কারণ, এক অখ্যাত অজ্ঞাত গণ্ডগ্রামে তাঁর আবির্ভাব— যেখানে তখনও সংবাদপত্র বা বেতার-যন্ত্রের ব্যবহারের প্রচলনই ঘটেনি। তবে তাঁর সূক্ষ্ম মনে বা অলৌকিক শক্তি-সত্তায় সে-সংবাদ, সে বার্তা যে পৌঁছায়নি তা বলা যাবে না— যদি তাঁর জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর দিব্য ভাবের প্রকাশের কথাকে আমরা বুঝতে পারি।

বাজিতপুর আশ্রম।

স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনে দেখা যায়— যখন তিনি শিশু, তখন তাঁর মধ্যে কোনো কান্নাকাটি, বায়না করা এমনকী খাওয়ার জন্যও কোনো ব্যাকুলতা কেউ দেখেনি। দেখেছে তিনি যেন আত্মমগ্ন, সমাহিত ও সতত নিজ শুদ্ধ সত্ত্ব সত্তায় সর্বদা বিরাজিত। তাঁর এই আত্মমগ্নভাব, সমাহিত ভাব, নিজ শুদ্ধতায় বিরাজিত থাকার যে চেষ্টা— তা বুঝা যায় কী-ভাবে? যখন তিনি বলেন, '৫/৬ ঘণ্টা জপ ধ্যান তো ন্যাংটা বয়সেই করেছি'। আবার একটু বয়স হতে না হতেই দেখা গেছে তিনি যেন কারও অঙ্গ স্পর্শ করতে চাইছেন না। হরিনাম সঙ্কীর্তনে অত্যন্ত আনন্দ। আপন মনে এক তাল কাদা নিয়ে শিব গড়েন। আর তার উপর ফুল ও বেলপাতা দিয়ে হয়ে যান ধ্যানস্থ। মাতৃদেবীর তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানোর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেব দর্শন করেন এবং আরো বড় হয়ে তাঁর আহারে বিহারে নিজস্ব স্বতন্ত্রতা, নিজস্ব চেষ্টা কা'কে না বিস্মিত করে? যখন তিনি পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেননি, তখন তিনি যোগসাধনা করছেন। যোগসাধনায় ব্যতিক্রমের ফলে নাসাপথে রক্তক্ষরণের কারণে বলছেন 'যোগক্রিয়ার ব্যতিক্রমের জন্যই হয়েছে।' তাঁর শরীরে প্রবল জ্বর— যে জ্বর হাতির মতো বিরাট শরীর প্রাণীর ক্ষেত্রেই একমাত্র হতে পারে, তা' তাঁর শরীরে দেখা দিলে তিনি নির্বিকার চিত্তে বলেছেন, 'আপনা থেকেই সেরে যাবে'। ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য মাছ-মাংস, ঘি-দুধ প্রভৃতি খাওয়া ত্যাগ করে শুধুমাত্র ভাতে ভাত, জলভাত, আলুসেদ্ধ ভাত মাত্র খান, কঠোর ব্যায়াম, মৃত্যুচিন্তা করেন। কষে কৌপীন ধারণ করেন। নিদ্রা-সংযম, বাক্-সংযম, দৃষ্টি-সংযম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রিপু ও ইন্দ্রিয় দমনে সচেষ্ট। সবসময় থাকেন অন্য জগতে। সর্বদা আনমনা উনমনা ভাব। যেন দেহ থেকেও দেহে নেই। যার পরিণামে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁর ১৬/১৭ বৎসর বয়সে মহাযোগী গুরু গম্ভীরনাথজীর নিকট দীক্ষা নিতে গেলে তিনি তাঁকে দেখেই বলেন--- 'তোমার আবার দীক্ষার কি প্রয়োজন, তোমার সাধনা তো হয়েই গেছে।' দিদি হেমাঙ্গিনী দেবীকে বলেন— 'দেখবি দিদি আমি এমন মানুষ হব, যে মানুষ আমাকে তিল তিল করেও পাবে না। বলছেন— 'দেখ, ওই যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা বিরাজিত, এই দেহের প্রতি রোমকূপের মধ্যেও তাই আছেন।'

সুতরাং যিনি ওই বালক বয়সে ওই সকল কথা বলতে পারেন, ওই সকল আচরণ যাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়— তিনি কি সাধারণ বালক-মাত্র? যে সাধনার পদ্ধতিতে এগিয়ে তিনি শিবত্বে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, লাভ করেছেন আত্মতত্ত্বোপলব্ধি, মহামুক্তি; হয়েছেন নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন, সেই সাধনার জন্য প্রয়োজন মহাযোগী বাবা গম্ভীরনাথজীর মতো সিদ্ধ সমাহিত মহাযোগীর কৃপা ও তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থেকে সাধন জীবনের প্রাত্যহিক অনুশীলন; অথচ ওই বয়সে তেমন গুরু পাওয়া দূরে থাক, বাজিতপুরের গণ্ডীই যিনি অতিক্রম করলেন না, অধিকাংশ সময় বাড়ির চিলেকোঠায় বা নিজের সাধন কুটিরেই আবদ্ধ থাকলেন; তাঁর মধ্যে একজন অতি উত্তম মহাযোগীর সাধন-পদ্ধতি ও নিষ্ঠাসহ সাধনার অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। অন্য কারও কৃপা ছাড়াই শুধু আত্মকৃপাতেই তিনি সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে বিচরণ করে, সাধনার সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে গেলেন। অতএব তাঁর সাধনার অতি উচ্চ স্তরে বিচরণ এবং সিদ্ধির দ্বারে উপনীতি বা তাঁর সাধনা সম্পর্কে মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর ওই যে স্বীকৃতি তা থেকে তিনি যে কোন স্তরের মহাপুরুষ, তা অনুমান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় বা হয় না। কিন্তু বলতে দ্বিধা হয় না— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতোই তিনি মাতৃজঠর থেকে তো বটেই,ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও সর্বদা জানতেন তিনি কে, কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, কী জন্য এসেছেন, কী তাঁর করণীয় কর্তব্য বা কোন পথে এবং কেমনভাবে তাঁকে চলতে হবে। আর এই সব কথা তাঁর মনে সতত জাগ্রত থাকার ফলেই হয়তো কখনো তাঁর একটি পা'ও বেতালে পড়েনি। কোনো বাধাই তাঁর চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেনি। স্বামী প্রণবানন্দজীর সম্পর্কে শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী যে কেউ সঠিকভাবে বুঝতে চান, বলতে চান— তাঁকে আগে তাঁর জীবনের প্রথম সোপানটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে। সেটি যথাযথভাবে না বুঝলে তাঁকে ঠিকমতো বুঝা যাবে না। বলাও যাবে না। আর তখনই মনে হবে হয়তো তিনি মানবপ্রেমী, তিনি হয়তো মানবসেবী, হয়তো জীবপ্রেমী, হয়তো সেবাব্রতী, বা হয়তো একজন যোগী...ইত্যাদি— যার কোনোটির মধ্য দিয়েই তাঁর পরিপূর্ণ স্বরূপটি প্রকাশিত হয় না। বরং সবগুলিকে একত্র করার পর

হয়তো তাঁর পরিপূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হতে পারে।

শুধু তাই নয়, তাঁর সম্পর্কে বুঝতে গেলে, বলতে গেলে আরও যে কথাগুলি ভাবতে হবে, তা' হলো— যখন তিনি শুধুমাত্র ব্রহ্মচারী বিনোদ, তখন হরিদ্বারের মহামণ্ডলেশ্বর ও স্বনামধন্য মহাযোগী ভোলানন্দ গিরিজীকে বলছেন, 'আমি কে জান? আমি বাবা গম্ভীরনাথ। আমি ইচ্ছা করলে এখনই এই সূর্যমণ্ডল বিধ্বংস করতে পারি, ইচ্ছা করলে যোগশক্তি প্রভাবে তোমাকে ভস্ম করে ফেলতে পারি। আমি এসেছি সহস্রগুণ শক্তি নিয়ে— একটা নতুন ভাব দেওয়ার জন্য। জগৎকে একটা নতুন shape দেওয়ার জন্য, সহস্র সহস্র লোককে গঠন করার জন্য।'

বলছেন— 'আজ আমি যা করতে যাচ্ছি, তা বাবা গম্ভীরনাথজী থাকলেও তিনি বুঝতে পারতেন কি-না সন্দেহ।' নিজেকে বলছেন--- 'কোনো সিদ্ধসমাহিত মহাপুরুষও তাঁর আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হবেন কি-না সন্দেহ।' বলছেন- 'ভূত-ভবিষ্যৎ- বর্তমান' তাঁর নখদর্পণে। বলছেন— তিনি 'অন্তশ্চক্ষু বিশিষ্ট'। আরো আশ্চর্যের কথা--- যিনি সমগ্র বিশ্বের জাগরণের, বিপ্লবের বা পরিবর্তনের কোনো বার্তা না পেয়েও বাজিতপুরের নিভৃত কুঞ্জে বসেই বলছেন— 'এ-যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ-যুগ মহামিলনের যুগ, এ-যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ, এ-যুগ মহামুক্তির যুগ।' —তিনি কে, তিনি কি সাধারণ মানুষ না সাধারণ মহাপুরুষ? সেই সঙ্গে ভাবতে হবে সঙ্ঘ-গঠনের পরে যিনি দেশ জুড়ে সেবাব্রত নিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন— তাঁকে ওই বালক বয়সে কে শেখালো যে অর্ধমৃত বাচ্চা গোসাপটি দুধ খাওয়ালে সে সুস্থ হবে ও বেঁচে যাবে? কে শেখালো যে গ্রামের ওই প্রতিবেশীর খাওয়ার অন্ন নেই, অন্ন দাও; পরনে বস্ত্র বা শীতে কম্বল নেই, তাকে বস্ত্র দাও, কাপড় কম্বল দাও। বা কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য ছুটে যাওয়া— এগুলি ওই বয়সে তাঁকে কে শেখালো এবং যে বয়সে ছেলেরা খেলাধুলা, আনন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র বালিগঞ্জের প্রবেশদ্বার।

আমোদে থাকে, সেই বয়সে তাঁর ওই মতিগতি কেন? না, সেসব কথা তাঁকে শেখাতে হবে, বলতে হবে কেন? তিনি সেই ভাবনা, সেই কর্ম করার জন্যই জগতে এসেছিলেন এবং তেমনভাবেই নিজের জীবনের গোড়া থেকেই আচরণও করে গেছেন। যে জন্য তাঁর উক্তি— 'লোকে জপ করে কাঠের মালায়, তুলসীর মালায়— আমি আজীবন জপ করেছি জাতিগঠন, জতিগঠন, জাতিগঠনের মালায়'—তা খুবই যথার্থ।

ভারতীয় সাধক সমাজের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হলো— আত্মনোমোক্ষার্থং অর্থাৎ আত্মমুক্তির জন্য তপস্যা বা সাধনা। আর দ্বিতীয়টি হলো সেই সাধনা বা তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পর জগদ্ধিতায় বা জগৎ-কল্যাণের কাজে ব্রতী হওয়া। সেই প্রয়োজনে তাঁরা আশ্রম, মঠ, মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবর্তন করেন ধর্মচক্র ও কর্মচক্রের। আবার অনেক সাধকের জীবনে দেখা যায়, তাঁরা সাধনা করে গেলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরিগণ লোককল্যাণের কাজে ব্রতী হন।

স্বামী প্রণবানন্দজীর ক্ষেত্রে কিন্তু তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বলা যায়—তাঁদের বিপরীতে তিনি অবস্থান করেছেন। তাঁর একই সঙ্গে দু'টি ধারা--- সাধনা এবং লোককল্যাণ, আত্মনোমোক্ষার্থং এবং জগদ্ধিতায় ব্রত সমানভাবেই চলেছে। আগে সাধনায় সিদ্ধিলাভ, তারপর লোককল্যাণ, এমন ব্রত তাঁকে নিতে হয়নি। কারণ নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হয় না— তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি পরবর্তী পদক্ষেপটি কোথায় পড়বে, কীভাবে পড়বে, তার ফল কী হবে, তা' যথাযথভাবেই অনুভব করার শক্তি রাখতেন। তাঁর নিজের ভাষায় সেকথাটি

হলো— 'সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় তাঁর জীবন ও কর্ম সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত'। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় পরিচালিত হওয়ার জন্যই তাঁর পা কোনোদিন বেতালে পড়েনি।

আর তাই দেখা যায়, তিনি সিদ্ধিলাভ ও সঙ্ঘ গঠন করার পর ধর্ম-সংস্থাপন ও জাতিগঠন ব্রতের জন্য যে-সকল কর্মসূচি নিয়েছিলেন, সেই প্রতিটি কাজেরই সূচনা তাঁর সিদ্ধিলাভ ও সঙ্ঘ- গঠনের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে-জন্যই আবারও দেখা যায়— যখন তিনি নিতান্ত বালক, তখনই তাঁর মধ্যে সেবার ভাব প্রকাশিত হচ্ছে। ছাত্রাবস্থায় যখন তিনি বিদ্যালয়ে পাঠরত, তখন ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে দল গঠন করেছেন, সেই ছাত্ররা যেমন তাঁর উপদেশমতো নিজেদের জীবন গঠন করেছে, তেমনি তাঁর নির্দেশমতো তারা মানুষের নানাভাবে সেবাও করেছে। সেভাবেই সেদিন কে অসুস্থ, কে অসহায় তাদের পাশে স্বামী প্রণবানন্দ বা তৎকালীন বিনোদ সেবার পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন। সঙ্ঘগঠনের পর তাঁর সেই কাজগুলিই আরও বিস্তৃত হয়েছে। আরও ব্যাপকতা লাভ করে ধর্মসংস্থাপন এবং জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর যে আবির্ভাব, তাকেই বাস্তবায়িত করেছে।

স্বামী প্রণবানন্দজীর সিদ্ধিলাভ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, বাজিতপুরে। সে-সময় নাম ছিল বাজিতপুর সেবাশ্রম। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নামকরণ হয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। তিনটি ঘটনাই তাঁর আবির্ভাব-তিথি শ্রীশ্রীমাঘী পূর্ণিমায়। অবশ্য যদি কেউ এমন কথা বলে থাকেন, যে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ হিসাবে ২০১৬ খৃষ্টাব্দকে ধরা হচ্ছে, সেটি তো বাজিতপুর সেবাশ্রম, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কীভাবে হয়? কথার যৌক্তিকতা থাকলেও আমাদের মনে রাখতে হবে, যখন গণেশবাবুর বয়স গণনা করা হয়, তখন তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকেই গণনা করা হয়। জন্মের কয়েক মাস পরে যখন তাঁর অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হয়েছিল, সে-সময় থেকে তো গণনা করা হয় না। (অবশ্য ইদানীংকালে না-কি Birth Certificate নেওয়ার সময়ই শিশুর নাম বলে Certificate নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।) সুতরাং সঙ্ঘের আজ যে শতবর্ষ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাকে ধরে করা হচ্ছে, সেটি অবশ্যই ঠিক।

প্রবন্ধের সূচনায় বলা হয়েছে শ্রীভগবানই অবতাররূপে, আচার্যরূপে, যুগাচার্যরূপে, অবধূতরূপে এসে জগতের মঙ্গলে, জীবের কল্যাণে কাজ করেন। অনেক সময় তিনি প্রয়োজনে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হয়েও আসেন--- যা বুঝা যায় তাঁর কর্মলীলার মধ্য দিয়ে।

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীও যে একজন তেমন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অবতার বা যুগাচার্য বা আচার্য, তার প্রমাণ দেয় তাঁর কর্মলীলা। তার একটি পরিচয় হলো তাঁর সঙ্ঘের নামকরণ। তিনি তাঁর সঙ্ঘের নামকরণ নিজের নামে করলেন না, গুরুর নামেও করলেন না, কোনো দেবতা বা কোনো সম্প্রদায়ের নামেও তিনি করলেন না। তিনি তাঁর সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্রের বিরাট পরিধি বুঝিয়ে দিতে নামের মধ্যে 'ভারত' কথাটিকে রাখলেন। যদিও বহু ভাষাভাষী ও বহু ধর্ম- সম্প্রদায়ের দেশ ভারতবর্ষ। তবুও তিনি সমগ্র ভারতকে তাঁর কর্মকেন্দ্র রূপে বিস্তৃত করে, দেশের সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্মের মানুষকেই নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এনে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির পুনঃ সংস্থাপন ও জাতিগঠনের কাজটি করতে চেয়েছেন। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য যে কোনো সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, যে-কোনো পন্থাবলম্বনকারীই হোক না, সে তো সনাতন বৈদিক ধর্মের অনুসারী। সুতরাং তাকেই সনাতন বেদের ধর্মের অনুসারী করে গড়ে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি নতুন করে কোনো পৃথক সম্প্রদায়, কোনো পৃথক মতাবলম্বী গড়বেন কেন? তিনি জগতে এসেছিলেন গড়তে, ভাঙতে নয়। তাঁর আগে অনেক ধর্মাচার্যই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো ধর্মাচার্য নিজের নামে, নিজের গুরুর নামে বা অন্য নামেও যে মত, পথ, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে মূল সনাতন হিন্দুধর্মের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই তিনি চাইলেন

হিন্দুধর্মকে অখণ্ড করে, বিরাট ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে। আর তাঁর সেই হিন্দুধর্ম গঠন হবে সমগ্র ভারত জুড়ে। কারণ, এই সমগ্র ভারতকেই তিনি নিজ সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্ররূপে নির্ণয় করেছেন। ভারতীয় জাতীয়তা যাতে পুনর্গঠিত হতে পারে, তাও তাঁর সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য।

তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চান বলেই সঙ্ঘের নামের মধ্যে 'সঙ্ঘ'— শক্তি সূচক শব্দটি রেখেছেন। তিনি সমগ্র জাতিকে (জাতি অর্থে হিন্দুজাতি) বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্যের মতো নতুন করে আদর্শ ও তপঃশক্তিতে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন। আর নামকরণ 'আশ্রম' কথাটি রাখার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সনাতন বৈদিক আদর্শই সঙ্ঘের ভিত্তি'। যেহেতু সঙ্ঘ মানুষের আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক, আধিভৌতিক ত্রিবিধ সেবাই করবে, সেজন্য 'সেবা' কথাটিও তিনি রেখেছেন।

এখানে একটু ভেবে দেখার বিষয়—তাঁর দৃষ্টি, তাঁর চিন্তা ও উদ্দেশ্য কতখানি সুদূরপ্রসারিত হলে, তিনি সে-সময় বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, বহু মত পথ অবলম্বনকারী হিন্দু সমাজেরই মানুষ হয়েও পৃথক কোনো সম্প্রদায় গঠন না করে সমগ্র

তীর্থ সংস্কার— গয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

সমাজকে এক করে দিতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর বিরাটত্ব, তাঁর বিশালত্ব, তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয়। তিনি শুধু আচার্য বা অবতারই ছিলেন না। ছিলেন অবতার বরিষ্ঠ। অবতার বরিষ্ঠগণের লক্ষণই হলো— তাঁদের পূর্বের ও সমকালীন সমস্ত আদর্শের সমন্বয় সাধন করা। সেজন্য তিনি যেমন যুগাচার্য নামে অভিহিত হন, তেমনি তিনি সমন্বয়াচার্যও। তাঁর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে ওই একটি জীবনে কতগুলি বিরাট জীবন, মহৎ জীবনের সমাবেশ ঘটেছে। তিনি যোগাচারে ছিলেন নাথপন্থী, সন্ন্যাসে শঙ্কর, সঙ্ঘ রচনায় শ্রীবুদ্ধ, প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ, ধর্মসংস্থাপনে শ্রীকৃষ্ণ, শাসনে রুদ্র, মর্যাদায় শ্রীরাম, কল্যাণে শিব, কর্মসাধনে বিশ্বতোবাহু বিশ্বকর্মা, অন্নদানে অন্নপূর্ণা, সংগ্রামে সেনাপতিত্বে কার্তিক এবং গণসংগঠনে স্বয়ং গণেশ্বর। সমকালীন মহাপুরুষদের সম্পর্কে তাঁর ছিল উচ্চ ধারণা, উচ্চভাব, আত্মিক সম্পর্ক। তিনি কোনো ধর্মকেই, কোনো সম্প্রদায়কেই ছোট করে দেখেননি। সকলকেই সম্মান দিয়েছেন। এমনকী ইসলাম ধর্মাবলম্বী, খৃষ্টান মতাবলম্বীদের মধ্যেও তাদের ধর্মের যে গুণ, যে আদর্শ, তার প্রতি তাদের অনুরক্ত হতে বলেছেন— এ বৈশিষ্ট্য যথার্থ সমন্বয়াচার্যের মধ্যেই একমাত্র দেখা যায়।

এখন দেখা যাক্, সনাতন বৈদিক আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বা ধর্মের পুনঃ সংস্থাপনে ও জাতিগঠনে বা ভারতীয় জাতীয়তার পুনর্জাগরণে যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী কী কী ভূমিকা নিয়েছিলেন বা কোন্ কোন্ পথে তিনি দেশ-জাতির মঙ্গল বিধান করতে চেয়েছেন।

এ-বিষয়ে 'শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য-জীবন-চরিত'-এর রচয়িতা স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীযুগাচার্যের জগন্মঙ্গল কার্যাবলীর প্রথমেই দেখিয়েছেন ব্যক্তিজীবন গঠন বা নৈতিক চরিত্র গঠন আন্দোলন বা ব্রহ্মচর্য আন্দোলনকে।

ব্যক্তিজীবন সুন্দর ও সুগঠিত না হলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না— একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও অত্যন্ত সত্য ও সঠিক যে, ব্রহ্মচর্যের সুরক্ষা ছাড়া কোনো মানুষেরই শরীরের যেমন সুগঠন অসম্ভব, তেমনি মনেরও বিকাশ অসম্ভব। আর তেমন মানুষ যার দেহ ও মনেরই বিকাশ হয়নি, তাদের দ্বারা দেশ-জাতি-সমাজের কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? তাই তিনি সেদিন অত্যন্ত দুঃখ করেই বলেছিলেন— স্বদেশী স্বদেশী করে কী হবে, যারা দেশের ভবিষ্যৎ তারাই সব মনুষ্যত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মচর্যহীন, আশা উৎসাহহীন যারা, তাদের দ্বারা দেশ-জাতি-সমাজের কল্যাণ কী করে সম্ভব? দেশের বালক ও যুবকদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, তাদের কষ্টসহিষ্ণু করতে হবে, স্বাবলম্বী করতে হবে। তিনি নিজে যখন ছাত্র, তখন থেকেই ছাত্র ও যুবকদের জীবন ও চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। সঙ্ঘ গঠনের পর সে কাজের প্রতি তিনি আরও অধিক দৃষ্টি দিয়ে ছাত্রদের চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হন। সেই প্রয়োজনে যেমন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেন, তেমনি প্রত্যেক আশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে একটি করে বিদ্যার্থীভবনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া সঙ্ঘসেবক সম্মিলনীর মাধ্যমে স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনি জীবনগঠনের প্রেরণা দিতে থাকেন। এই ব্রহ্মচর্য আন্দোলন বা ব্যক্তি জীবন-গঠন আন্দোলন যত বেশি সফল হবে, ততই পরিবার জীবন তথা সমাজজীবন সুন্দর হতে পারবে। কারণ ব্যক্তির সমষ্টিই তো পরিবার ও সমাজ। সুতরাং একজন সুন্দর হলে বহু একের সমন্বিত পরিবারটিও যে সুন্দর হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীযুগাচার্যের ওই আদর্শের অনুসরণেই দেশের নানা স্থানে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য জীবন চরিতে শ্রীশ্রীযুগাচার্যের দ্বিতীয় যে লোককল্যাণ কর্মকে বর্ণনা করা হয়েছে— সেটি হলো গার্হস্থ্য আন্দোলন বা পরিবার জীবন গঠন। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক, পবিত্র সম্পর্ক যাতে গড়ে উঠে, পরিবার জীবনে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; সেটি ঠিক করে দেওয়া। আর সেটি হলেই তো তাদের সন্তানগুলিও হবে সুসন্তান। তিনি গৃহীদের শোনালেন— 'গৃহস্থ তুমি গৃহস্থই থাক। ধর্মলাভ করার জন্য তোমাকে সংসার ছেড়ে অরণ্যে গিয়ে নির্জনে যোগ-ধ্যান- তপস্যা করতে হবে না। যে ব্যক্তি যেখানে যে জীবিকাবৃত্তি, যে-কর্তব্য অবলম্বন করে আছ,

সেখানেই থাক। ধর্মলাভের জন্য তোমাকে সে-স্থান থেকে এক পাও নড়তে হবে না। ভারতের ঋষি, ভারতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে স্বধর্ম পালন করতে বলেছেন।'

ওই গার্হস্থ্য আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি গয়া প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রেরও সংস্কারের কাজ শুরু করেন। তীর্থ সংস্কার কাজের প্রয়োজনটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— এ কারণে যে ভারতভূমি তীর্থময়। ভারতবাসী মাত্রই তীর্থের প্রতি আকর্ষণ প্রতিনিয়তই অনুভব করে। আর সেই তীর্থভূমির পরিবেশ যদি শুদ্ধ না হয়, সুস্থ না থাকে, সে স্থান মানুষের মনে আতঙ্কের কারণ হয়— তাহলে দেশে সুস্থ পরিবেশ তৈরি হবে কী করে। কারণ মানুষ যেমন তীর্থে যাবে, তেমনি তীর্থকার্য, দেবদর্শন প্রভৃতিও করবে। সেজন্য তিনি গয়া প্রভৃতি তীর্থের শুদ্ধ ও সুস্থ পরিবেশের বাধা স্বরূপ পাণ্ডা ও পুরোহিতদের সংশোধন করে তীর্থের পবিত্র পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হওয়ায় দেশের তীর্থগুলি কলুষমুক্ত হয়। মানুষের মনেও স্বস্তি ফিরে আসে। দেশের আজ প্রায় প্রতিটি তীর্থেই সঙ্ঘের স্থায়ী আশ্রম গড়ে উঠেছে মানুষের সেবায় স্বামী প্রণবানন্দজীর আদর্শে কাজ সেখানে চলেছে।

তীর্থ-সংস্কারের মতোই তাঁর অপর কর্মান্দোলন--- চারণদল গঠন। এই চারণদলের কাজ হলো— দেশের মানুষ দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে শাস্ত্র থেকে যেমন দূরে সরে গেছে, তেমনি তাদের যে প্রাচীন গৌরব-গাথা, বীরত্বের কথা, ত্যাগ ও তপস্যার কথা, পূর্বপুরুষদের মহান কীর্তির কথা— ভুলে গেছে। চারণদল দেশের ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে সেই গৌরবগাথা, কীর্তিকথা, শাস্ত্রের বার্তা মানুষকে শোনাবে; যার মধ্য দিয়ে দেশবাসী আবার তার অতীত গৌরবকে ফিরে পেতে উদ্বুদ্ধ হবে, অনুপ্রাণিত হবে। শ্রীশ্রীযুগাচার্যের নির্দেশে আজও সঙ্ঘের চারণদলগুলি তাঁর আদিষ্ট কর্মই করে চলেছে।

'শ্রদ্ধা' এবং 'সেবা'—এই দু'টি মানবিক গুণ সমাজকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখতে পারে। পারে ধরে রাখতে। কারণ 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এমন ভাবনায় যদি সবসময় একে অন্যের সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, তবে মারামারি, কাড়াকাড়ি এবং কাটাকাটিও থাকে না। এরকমভাবেই আমরা যদি সব সময় গুরুজনদের প্রতি সশ্রদ্ধ হই, তাঁদের সম্মান দিতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হই, তাহলে তাঁদেরও স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্বাদ ছোটদের প্রতি নিঃসন্দেহেই সতত বর্ষিত হবে। তাহলে তখন কি আর ছোট বড়-র দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, বিচ্ছেদ- বিচ্যুতি থাকবে? নিশ্চয় থাকা উচিত নয়। কিন্তু ওই দুটি মৌলিকগুণের অভাবেই সমাজে দিনের পর দিন অঘটন ঘটেই চলেছে। সংসার সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়— সন্তানেরা বাবা-মা'কে, স্ত্রী স্বামীকে, ছাত্র শিক্ষককেও অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার চেখে দেখে। সুতরাং এমন অবস্থা যদি সংসার সমাজে মারণ রোগের আকারণে ধারণ করে, তাহলে সংসার সমাজে শান্তি থাকবে কী উপায়ে? আর সংসার সমাজ সুরক্ষিত হবেই বা কী উপায়ে?

তাই সমাজ-সংগঠক যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী চাইলেন, সমাজে যা'তে শ্রদ্ধা এবং সেবার পরিবেশ ফিরে আসে, সমাজের মানুষ শান্তি ও সুখ পায়— সেজন্য তিনি করলেন গুরুপূজা আন্দোলনের সূচনা। আর বললেন, 'আমার এই গুরুপূজা আন্দোলন থেকে স্ত্রী শিখবে স্বামীকে কীভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়, ভক্তি করতে হয়; সন্তানেরা শিখবে বাবা-মা'কে কীভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে হয় এবং ছাত্ররা শিখবে কীভাবে শিক্ষকগণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে হয়।'

শ্রদ্ধা ও সেবার মত মহামূল্যবান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ দু'টি সরাসরি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজকে, সংসারকে যদি সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়, তখন সমাজ-সংসার রক্ষার প্রয়োজনে যেটির একান্ত আবশ্যকতা দেখা যায়, সেটি হলো— শক্তি, দৈহিক শক্তি। নিত্যদিনের কাজকর্ম করার শক্তি, সম্পদ রক্ষা করার জন্য শক্তি, বিরুদ্ধবাদী আগ্রাসী শক্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্যও চাই শক্তি। এই শক্তির অভাব ঘটলেই সব শান্তি, সব সুখ নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া এই পৃথিবীতে সেই বেঁচে থাকতে পারে, টিকে থাকতে পারে— যার শক্তি আছে, বীর্যবত্তা আছে, যে সংগ্রামকে ভয় পায় না। সেজন্য বলা হয় 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। সুতরাং বীর হতে হবে, হতে হবে শক্তিমান, বীর্যবান। হিন্দু যে সকল দেবদেবীর পূজা করে, মান্যতা দেয়--- তাঁরা প্রত্যেকে শক্তিমান, প্রত্যেকের হাতে অস্ত্রশস্ত্র। তাঁরা তাঁদের হাতের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্য দিয়ে হিন্দুকে শক্তিমান, বীর্যমান হওয়ার শিক্ষাই প্রতিনিয়ত দিচ্ছেন। অতীতে হিন্দু ওই সকল অস্ত্রের বলে বলীয়ান হয়ে, ওই সকল অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে আসুরিক শক্তিকে পরাজিত করে নিজের জয়যাত্রাকে অপ্রতিরোধ্য করে রাখতে পেরেছিল বলেই তারা এমন গৌরবের অধিকারী হতে পেরেছিল। কিন্তু যেদিন থেকে তারা সেই পথ থেকে সরে এসেছে— সেদিন থেকেই তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এসেছে দুঃখ, এসেছে বিপর্যয়।

ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দজী হিন্দুর সেই ব্যাধি, সেই দুর্বলতা দূর করে জাতিকে শক্তিমান, বীর্যবান করে তুলতেই দেশজুড়ে শুরু করলেন শক্তিপূজার আয়োজন। হিন্দু জাতিকে তাদের উপাস্য দেবদেবীর লীলাভিনয় দেখিয়ে দিতে, বুঝিয়ে দিতেই বললেন— শিবের হাতে ত্রিশূল, শ্রীরামচন্দ্রের হাতে ধনুর্বাণ, শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন, মা কালীর হাতে রক্তাক্ত খড়্গ, দেবী দুর্গার হাতে দশপ্রহরণ দেখে হিন্দুকে বুঝতে হবে, শিখতে হবে, সেগুলি কেন? শেখালেন— যে দেব-দেবীর হাতে যে অস্ত্র, সেই দেবদেবীকে সেই অস্ত্র দিয়েই পূজা করতে হবে, করতে হবে তাঁর আরতি, তাহলেই তিনি অধিক প্রসন্ন হবেন। করবেন যথার্থ আশীর্বাদ।

উপরোক্ত কর্মান্দোলনগুলির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জাতিগঠনে আরও যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিলেন--- সেটি হলো 'হিন্দু-সমাজ- সমন্বয় আন্দোলন।' এই আন্দোলনের যে প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা আজকের দিনেও সমাজের দিকে বিশেষভাবে তাকালে যে দেখা যাবে না, যে বুঝা যাবে না তা নয়। সমাজে আজও যে

উঁচু-নীচু, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে রেখেছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ জনসাধারণের থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজকে যে পৃথক করে রেখেছে, তা সেদিন ছিল আরও ভয়ানক। আর সেদিন সে-কারণেই হিন্দু সমাজ যেমন দুর্বল হয়েছিল, তেমনি সমাজের বৃহত্তর ওই জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য হিন্দুবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের দলে টেনে নিতে ছিল সমানভাবে উদ্যোগী। যার ফলে দীর্ঘদিন যারা ছিল আপন ভাই, আপন বোন, তারাই হয়ে গেল তার শত্রু। এ যেন স্বামী বিবেকানন্দজীর কথায়— 'কোনো লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তা নয়, একটি করে শত্রু বৃদ্ধি হয়।'

সুতরাং হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী করতে হলে, হিন্দু জাতিকে যথাযথভাবে গঠন করতে হলে— আগে চাই হিন্দুর উঁচু-নীচু, স্পৃশ্য- অস্পৃশ্য ভাব দূর করে আমরা সবাই হিন্দু— সেই এক ঋষির বংশধর— এই ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি সে-কাজেই যথাসম্ভব উদ্যোগী হলেন। সৃষ্টি করলেন— সকল শ্রেণীর হিন্দুর মিলনক্ষেত্র— হিন্দু মিলন মন্দিরের। আর হিন্দুকে বিপদে আপদে রক্ষার জন্য গড়ে তুলতে থাকলেন এক বাহিনী, যার নাম হিন্দু রক্ষীদল— যারা হিন্দুর বিপদে আপদে সবসময় তার ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি, মন্দির, দেবতা ও নারীকে রক্ষা করবে।

অহিন্দু যে সকল ধর্ম— তাদের মধ্যেও বহু ভেদাভেদ, বহু সম্প্রদায় থাকলেও তারা সবাই এক ধর্মের মানুষ। তাদের এক পরিচয়। কিন্তু হিন্দুর পরিচয় বহু— কেউ ব্রাহ্ম, কেউ আর্য প্রভৃতি। হিন্দুজাতি-সংগঠক স্বামী প্রণবানন্দজী তাই বললেন— 'হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার লোক নেই।' আমি তাই হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে 'আমি হিন্দু' 'আমি হিন্দু' জপ করাবো। এই হিন্দুত্ববোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিলুপ্ত তেজোবীর্য শক্তি সামর্থ্য জেগে উঠবে।

আজ যেমন দেশে একশ্রেণীর কল্পনাবিলাসী মানুষ, বাস্তব পরিস্থিতি দেখে

লন্ডনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

শুনেও 'একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' বলে কতই না আহ্লাদিত হন, কতই না সম্প্রীতির জয়ঢাকের বাজনা বাজাতে চান, আবার দেখেন কখন কোথায় পচা শামুকের খোলে তাঁর নিজের পা-ই কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। সেদিনও একদল মানুষ ছিলেন— যাঁরা হিন্দু সমাজের বিরাট অংশকে অবহেলিত দেখেও তাদের উন্নতিতে সচেষ্ট না হয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনে মহাজাতি গঠনে কত সচেষ্ট, কত না ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। অথচ হিন্দুতে হিন্দুতেই যেখানে মিলন নেই, সেখানে হিন্দু মুসলমানে মিলনের প্রশ্ন ওঠে কেমন করে? তাই হিন্দুর যথার্থ দরদি, মরমি, পথের সাথী, প্রকৃত বন্ধু যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী সেদিন বলেছিলেন— 'হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন যত শীঘ্র গড়ে উঠবে, হিন্দু মুসলমানে মিলন তত দ্রুত সম্ভব হবে।' তাঁর কথা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। কারণ জাতিগঠনের প্রচেষ্টা শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে হলেই তো চলবে না, হতে হবে ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ সকলক্ষেত্রে। স্বামী প্রণবানন্দজী জাতিকে ধর্মভিত্তিক গঠন করতে চেয়েছেন। দেশে প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক দুর্যোগের অথবা গরিব ও দুঃখী মানুষদের মুখে আহার্য দিতে, পরিধানে বস্ত্র দিতে, অসুস্থতায় চিকিৎসা দিতে, গৃহহীনে গৃহ দিতে, শীতার্তকে কম্বল দিতে বা অন্যান্যভাবে সাহায্য করতে তাঁরই সন্তানদল নিরন্তর পরিশ্রম করছে।

এভাবে ভারতবর্ষের বিশাল হিন্দু-সমাজকে ধর্মভিত্তিকে গঠন করার জন্য যা যা করার প্রয়োজন, তেমন কর্মসূচিই তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর আগে আর কোনো ধর্মনেতা, সমাজ-নেতা বা রাষ্ট্রনেতাই এভাবে জাতিকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ ও আয়োজন করেছিলেন কী-না জানি না। যতদূর বিশ্বাস তাঁর মত, তাঁর দেখানো পথেই ভারতবর্ষে জাতিগঠন কর্মসূচি যেমন একদিন সফল হবেই, তেমনি ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসনেরও অধিকারী হবে।

যদিও স্বামী প্রণবানন্দজীর বজ্রদৃঢ় শরীর— কিন্তু তাঁর বিপুল কর্মের স্রোতের সঙ্গে সেই শরীরও সমতাল রক্ষায় অক্ষম হয়ে পড়ে, যার ফলে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর কর্মক্লান্ত শরীর ত্যাগ করে তিনি সঙ্ঘ-শরীরে চির বর্তমান হলেন। বিশ্বস্রষ্টা যেমন সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করে সৃষ্টির মধ্যেই অবস্থান করেন, তেমনি তিনিও সঙ্ঘ সৃষ্টি করে, সঙ্ঘের ধর্মচক্র ও কর্মচক্র সৃষ্টি করে, সঙ্ঘেই বিরাজিত আছেন।

স্থূলত শ্রীশ্রীযুগাচার্য ওই স্বল্প বয়সেই সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা ও প্রায় ২৪ বৎসর প্রতিপালন করার পর অপ্রকট হন। তাঁর সৃষ্টি কর্মযোজনা, তাঁরই হাতে গড়ে তোলা সন্তানদল, তাঁরই প্রদর্শিত পথে অক্ষুণ্ণভাবে

৭৫ বৎসর যাবৎ এগিয়ে নিয়ে চলে আজ এই শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। তাঁর অবর্তমানে তাঁরই যোগ্য সন্তান সর্বশ্রীমদ্ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ, স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ, স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ, স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ, স্বামী অরূপানন্দজী মহারাজ, স্বামী অক্ষয়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী ত্রিদিবানন্দজী মহারাজ, স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ, স্বামী রামানন্দজী মহারাজ এবং পরবর্তীকালে যোগ্য উত্তরসূরি স্বামী বুদ্ধানন্দজী, স্বামী বিবিদিষানন্দজী এবং বর্তমানে স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজীর যোগ্য নেতৃত্বে সঙ্ঘ শ্রীশ্রীযুগাচার্যের অভিপ্রেত ব্রত সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বর্তমানে সঙ্ঘের প্রায় একশ'টি শাখাকেন্দ্র এবং প্রায় অর্ধসহস্র হিন্দু মিলন মন্দির শ্রীশ্রীযুগাচার্যের জগদ্ধিতায় সঙ্কল্প পূরণে ধর্ম-সংস্থাপন ও জাতিগঠনের কাজ করে চলেছে। অবিভক্ত বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে যে প্রতিষ্ঠানের আজ থেকে শতবর্ষ আগে জন্ম হয়েছিল, সেই প্রতিষ্ঠান আজ বাংলাদেশ ছাড়িয়ে, ভারতেরও গণ্ডী অতিক্রম করে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে প্রসারিত হয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে এবং বিশ্ববাসীকে সনাতন বৈদিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার নিরন্তর আহ্বান জানাচ্ছে। লক্ষ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীশ্রীপ্রণবান্দজীর অভিপ্রেত ধর্ম-সংস্থাপন ও জাতিগঠনের কাজ সঙ্ঘ নিরন্তর এ-ভাবেই করে যাবে। তার গতিরোধ কেউ করতে পারবে না। তার অভিমুখকেও কেউ ঘুরিয়ে দিতে পারবে না। কারণ স্বামী প্রণবানন্দ ঈশ্বরপুরুষ। তাঁর কর্ম ঈশ্বরের কর্ম। ঈশ্বরের অভিপ্রেত বা আকাঙ্ক্ষিত। তাই তাকে থামানো যাবে না। বরং যতই দিন যাবে, ততই তার বিশ্বগ্রাসী আদর্শ ক্রমশঃ বিশ্বের সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে— এমনটিই মনে হয়।

প্রসঙ্গত, এখানে বলা প্রয়োজন--- যুগাবতার স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ তাঁর সঙ্কল্পিত ধর্ম-সংস্থাপন ও জাতিগঠন কর্মকে বাস্তবায়িত করতে যে-সকল পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁর জীবনীকার স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ সেগুলির অধিকাংশকেই আন্দোলন নামে অভিহিত করেছেন। 'আন্দোলন' কথাটির অর্থ 'অনুশীলন' ও 'আলোচনা'। বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্যে নেওয়া কর্মসূচির যদি যথার্থভাবে অনুশীলন, আলোচনা না হয়, তবে তা' সফল হয় না। কিন্তু তা যতই বেশি অনুশীলন ও আলোচনা হবে, ততই তা' প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে জনমনকে প্রভাবিত করবে।

মহাবিপ্লবী স্বামী প্রণবানন্দজী দেশ-জাতি-সমাজের কল্যাণে যে কর্মসূচি নিয়েছেন, সেগুলির তিনি সূচনা করে গেছেন, সমাপ্তি ঘটিয়ে যাননি। সে-সকল কর্মসূচিকে অবলম্বন করেই সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীদের এবং সঙ্ঘাশ্রিত নরনারীকে এগিয়ে চলতে হবে, তাঁর লক্ষ্য পূরণে। আর যেহেতু সঙ্ঘকে সারাদেশব্যাপী, সারা জগৎ জুড়ে কাজ করতে হবে, অতএব তা যে দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং তাঁর প্রবর্তিত কর্মান্দোলনও অবশ্যই হবে দীর্ঘদিন ধরেই, বহু মানুষকে নিয়েই। পরন্তু বহু মানুষের জন্যও করে যেতে হবে। আর সেখানে সঙ্ঘকেই তার নেতৃত্ব দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই একথাও ঠিক যে— স্বামী প্রণবানন্দজীর লক্ষ্য পূরণে তাঁর প্রবর্তিত কর্মযোজনাকেও তাই যথাযথ রাখতে হবে।

পরিশেষে প্রবন্ধের শুরুর কথা দিয়েই বলি— শ্রীভগবান কথা দেন, আবার কথা রাখেনও। শিবাবতার স্বামী প্রণবানন্দজী শিবরূপে দুষ্টের বিনাশ ও শিষ্টের পালন এবং জগতে ধর্মের সংস্থাপন এবং অধর্মের দূরীকরণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— সেই প্রতিশ্রুতি তিনি যথাযথভাবেই রক্ষা করেছেন। এ-যুগে বেঁচে থাকার, নিজের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, নিজের ধর্ম-সংস্কৃতি- সমাজকে উন্নত করে তোলার যাবতীয় পথ তিনি দিয়ে গেছেন। এখন তাঁর প্রদর্শিত পথ ও কর্মযোজনাকে একান্তই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবলম্বন করে যথাযথভাবে এগিয়ে চললেই হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ, হিন্দু-সংস্কৃতি ও হিন্দুজাতির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী, অবশ্যম্ভাবী হিন্দুর জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ। তাতে ব্যর্থ হলে বিনাশ অনিবার্য। মনে রাখতে হবে তিনি বলেছেন— 'আমার আন্দোলনই শেষ আন্দোলন।' সুতরাং সেই আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের যেমন যুক্ত হতে হবে, তেমনই তাকে সফলও করতে হবে।

প্রসঙ্গত, আরো একটি কথা মনে হয়— সঙ্ঘের শতবর্ষে যাঁর কর্মযোজনার সাফল্যের কারণে আজ চারিদিকে এই আনন্দ, সেই আনন্দময় পুরুষ যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ কে? কেন এই সঙ্ঘের সৃষ্টি? কেন সঙ্ঘের এই সাফল্য? —তাও যেন অনুভবে আমরা সচেষ্ট হয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করি— 'তোমার পতাকা বহিবারে দাও শকতি।'

প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম শিব-ভগবান শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীচরণে।

(লেখক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র প্রণব পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ)

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর,

জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সবার প্রিয় ® বিল্লদা চানাচুর

হিন্দুসমাজের সাধু সন্ন্যাসী ও গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের দেশাত্মবোধের কথা, সংগঠিত হওয়ার কথা বললে হিন্দুদের কোনো সমস্যা হতো না : স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হিন্দু জনমানসে আজ একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান। হিন্দুত্বপ্রেমী মানুষের খুব প্রিয় এই ধর্মীয় সংগঠনটি। মুর্শিদাবাদ জেলা মুসলমান বহুল হয়ে যাওয়ায় হিন্দুরা অত্যাচারিত ও আতঙ্কিত। তারই মাঝে এলাকার হিন্দুদের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থলের ভূমিকা পালন করে চলেছেন বেলডাঙ্গার মঠাধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ যিনি কার্তিক মহারাজ নামে পরিচিতি। স্বস্তিকার দুই প্রতিনিধি জয়রাম মণ্ডল ও সুকেশ মণ্ডলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন খুবই আন্তরিকভাবে।

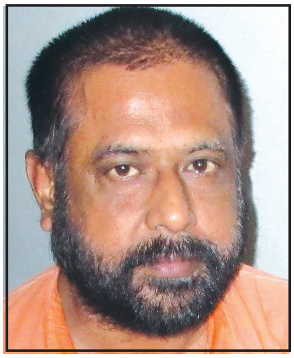

■ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ চলছে। অথচ হিন্দুরা এখনও নানা স্থানে নির্যাতিত হচ্ছে, হিন্দুদের মানসিকতার কি পরিবর্তন ঘটেছে?

■ আরো অবনতি হয়েছে, বিশেষ করে বাংলায়। এর কারণ হলো যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। নেতৃত্ব দানের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন। মন মুখ এক করে কাজ করবেন এমন নেতৃত্ব চাই, যাকে দেখে সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে। এটার খুবই অভাব মনে হচ্ছে।

■ বাংলাদেশে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সূচনা হয়েছে। অথচ সেখানেই আজ হিন্দু শূন্য হতে চলেছে। এক্ষেত্রে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভূমিকা কিরূপ?

■ এখনও বাংলাদেশে অনেকগুলি শাখা রয়েছে। সরকারি বেসরকারি মদতে সময়ে সময়ে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হতেই থাকে। তার মধ্যেই আমাদের সাধু মহারাজরা হিন্দুদের মনোবল ঠিক রাখার কাজ করে চলেছেন। তাঁরা যেন তাঁদের ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রাত্যহিক কর্ম বজায় রাখতে পারেন সে ব্যাপারে তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। বাংলাদেশ থেকে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। আমিও বাংলাদেশে গিয়েছি। ভারতে যদি হিন্দুদের এই অবস্থা হয়, তাহলে সেখানের হিন্দুদের অবস্থা একবার কল্পনা করে দেখুন। বর্তমানে আওয়ামি লীগ সরকারের আমলে হিন্দুরা কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে। তবে সেটাও বেশিদিন থাকবে না মনে হচ্ছে।

■ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ হিন্দু ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন। সেই ডাকে হিন্দুরা কতখানি সাড়া দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

■ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ যখন ডাক দিয়েছিলেন তখন হিন্দুরা যথেষ্ট মাত্রায় সাড়া দিয়েছিল। ১৯৩২ সালে একটা ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল হয়েছিল। তখনই গুরু মহারাজের মাথায় হিন্দু সংগঠন ও হিন্দু মিলন মন্দির তৈরির ভাবনা এসেছিল। তখন তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত ছুটেছেন। তিনি বলেছেন, কেউ জপ করে রুদ্রাক্ষ মালায়, কেউ জপ করে তুলসীমালায়, কেউ জপ করে কাঠের মালায়, আমি সারা জীবন জপ করেছি জাতি গঠন, জাতি গঠনের মালায়। তখন প্রবল পরাক্রান্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বরা ছিলেন—একদিকে গান্ধীজী, জহরলাল নেহরু, বাংলায় প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ। তার মধ্যে প্রণবানন্দজী মহারাজ নমঃশূদ্রদের সংগঠিত করে হিন্দুরক্ষী দল তৈরি করে যেখানে হিন্দুরা নির্যাতিত হয়েছে ঢাল-সড়কি, লাঠি নিয়ে ছুটে গিয়েছেন। তাঁর প্রখ্যাত বাণী ছিল—'যে মাথা নিতে ও দিতে পারবি সে আমার সঙ্গে আয়'। এভাবে তিনি হিন্দুদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

■ মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুরা এখন সংখ্যালঘু। সেখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভূমিকা কী, বিশেষকরে বেলডাঙ্গা আশ্রমের?

■ বেলডাঙ্গা আশ্রমের দায়িত্বে আমিই রয়েছি। চার পাঁচ বছর আগেও হিন্দুদের অবস্থা করুণ ছিল, চারদিকে ভয়ের পরিবেশ ছিল। হিন্দুদের বাড়ি থেকে গোরু চুরি,

ডাকাতি, জমির ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া, মা, বোনেদের শ্লীলতাহানি করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বেলডাঙ্গা আশ্রমের কারণে এখন হিন্দুরা অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মানসিকতা পেয়েছে। আমি সবাইকে বলি মার খেয়ে কেউ আমার কাছে এলে সাহায্য পাবে না, মার দিয়ে এলে আমি সবরকমের সাহায্য করবো। অর্থ দিয়ে, আইনিভাবে সে যাই হোক না কেন। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে মুসলমানদের সংখ্যা বেসরকারিভাবে ৮০ শতাংশ হয়েছে, প্রশাসনে প্রায় সবাই মুসলমান। রাজনৈতিক দলের মধ্যে মুসলমান নেতৃত্ব। হিন্দুদের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দল নেই। অন্যান্য সংগঠনও সক্রিয় নয়। পুলিশ প্রশাসন হিন্দুদের পক্ষে নেই। ফরাক্কা থানার অর্জুনপুরে শ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করতে বাধা দিচ্ছে। এককথায় মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের অবস্থা ভয়াবহ। বেলডাঙ্গা আশ্রম সর্বশক্তি নিয়ে হিন্দুদের পাশে আছে।

▯ মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রমের কী কী কাজ চলছে?

▯ জেলায় আমাদের প্রথম শাখা ঔরঙ্গাবাদে। তারপর ধীরে ধীরে ফরাক্কা, জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান, লালগোলা, জিয়াগঞ্জে শুরু হয়। এসবই স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজ করেন। এখন আমাদের ওপর দায়িত্ব এসেছে। প্রধানত আমরা স্কুল, ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র চালাচ্ছি। ছাত্রাবাসে আমরা তথাকথিত পিছিয়ে পড়া ও বনবাসী সমাজের ছেলেমেয়েদেরই রাখি। নবগ্রাম ব্লকের পলসণ্ডা খৃষ্টান অধ্যুষিত এলাকা। ওখানে গির্জা আছে। আমাদের সেবাকাজের ফলে তাদের ধর্মান্তরণের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেলডাঙ্গা আশ্রমের তত্ত্বাবধানেই এক হাজার ছেলেমেয়ে ছাত্রাবাসে থাকে। বেলডাঙ্গা আশ্রমে পাঁচশো ছেলে এবং চানকে পাঁচশো মেয়ে থাকে। যার ফলে ভোটের সময় সব রাজনৈতিক দল আমার কাছে আসে— এলাকার হিন্দুদের ভোট দিতে বলার জন্য। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো হিন্দুদের এত গুরু, সাধুসন্ন্যাসী আছেন তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের দেশাত্মবোধের কথা, সংগঠিত হওয়ার কথা বলেন না। এঁরা যদি দেশ, ধর্ম, জাতি, সমাজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতেন তাহলে হিন্দুদের কোনো সমস্যাই হোত না। ঠাকুরের আশীর্বাদে আমি হিন্দুদের মধ্যে এই কাজটি করতে পেরেছি।

▯ জেলায় জেলায় হিন্দু মেয়েরা অপহৃত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের মেয়েরাই লাভ জিহাদের শিকার হচ্ছে। সঙ্ঘ এক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করছে?

▯ যে সব মেয়ে অপহৃত হচ্ছে বা লাভ জিহাদের শিকার হচ্ছে তাদের অভিভাবকরা সচেতন নয়। আমাদের প্রথম কাজ তাদের সচেতন করা। এজন্য আমরা মাঝে মাঝে মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করে থাকি। মায়েদের আমরা বলে থাকি যে, মেয়ে যখন বড়ো হচ্ছে তখন তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে। বর্তমান সমাজ সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে হবে। দেশের ইতিহাস ও পারিবারিক মর্যাদার কথার কথা বলতে হবে। বেলডাঙ্গার পাশে বিষুরপুকুর গ্রামের একটি মেয়ে এক মুসলমান যুবককে বিয়ে করে চলে যায়। তারপর পাঁচ-ছয় মাস অত্যাচারিত হয়ে তার বাবার কাছে ফিরে আসে। তার ওপর অত্যাচারের বর্ণনা শুনে চোখে জল আসে। তার পরিবার তাকে গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। আমি খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে তার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে বুঝিয়ে যজ্ঞ করে তার হাতে খেয়ে তাকে তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে আসি। হিন্দু মেয়েকে মুসলমানরা নিয়ে গেলে খুবই আনন্দ উল্লাস করে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য। একবার বেলডাঙ্গার পাশের গ্রামের একটি হিন্দু মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে চলে যায়। তারা বিরাট প্যান্ডেল বানিয়ে কার্ড ছাপিয়ে এলাকার বিশিষ্ট লোকদের নিমন্ত্রণ করে, বাজনা বাজিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে। আমি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে খবরটা শুনে এম এল এ, এস পি, ডি এম-এর সাহায্যে বিয়ে বন্ধ করে দিই। হিন্দু মেয়েরা স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টার, কম্পিউটার সেন্টারে লাভ জিহাদের ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। মুসলমান যুবকরা হিন্দু ছদ্মনাম ব্যবহার করায় আমাদের মেয়েরা সহজেই ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। বিপদ ঘটে যাওয়ার পর অভিভাবকরা আমার কাছে ছুটে আসে। আমি যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করি। হিন্দু সংগঠনের কাজ আমরা যারা করছি তাদের যদি এই ঘটনাগুলিতে হৃদয়ে ব্যথা অনুভব না হয় বা প্রতিকার করতে এগিয়ে না আসেন তাহলে বেড়েই যাবে। আমার মোবাইল ফোন চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে, এরকম কোনো খবর এলেই সেখানে ছুটে যাই। সাহায্যের হাতে বাড়িয়ে দিই। এটার আজকে বড় অভাব। আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমি এগুলো করে যাচ্ছি।

▯ সীমান্ত এলাকায় ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের ভূমিকা কী?

▯ সীমান্ত এলাকায় কাজ করছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তবে আমাদের যাঁরা ভক্তশিষ্য আছেন তাঁদের আমরা বলি চোখ কান খোলা রাখতে। আমি নিজেও সীমান্ত এলাকায় বহুবার লোকদের সচেতন করতে গিয়েছি।

▯ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সেবাকাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু হিন্দু জাগরণের জন্য জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সঙ্ঘের ভূমিকা কী?

▯ সারা দেশে হিন্দু মিলন মন্দিরের যাঁরা দায়িত্বে আছেন তাঁদের নিয়ে দু'তিন বছর পর পর কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয়। পুরীতে হয়েছে, কলকাতায় হয়েছে। সেখানে আমরা হিন্দুজনমত গঠনের কথাই বলি। তাছাড়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব হয়। তখন হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার মানুষ সেদিন একত্রিত হন। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন একমাত্র ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘই করে থাকে। সেখানে ভোগ রান্না, আহুতি দেওয়া, অভিষেকের জল আনা— সব শ্রেণীর হিন্দুরাই করতে পারেন। কোনোরকম ভেদাভেদ করা হয় না।

▯ এক বিশেষ শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ইতিহাস বিকৃত করছে, তা রুখতে সঙ্ঘের ভূমিকা কী?

▯ ইতিহাস বিকৃত করার প্রধান দায় কংগ্রেস দলের। প্রথমে তারাই বিশেষ বিশেষ

বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দিরের সামনে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী

লোককে অর্থ দিয়ে এ কাজ করেছিল। জহরলাল নেহরু নিজেকে হিন্দু বলতে ঘৃণা করতেন। তিনি হিন্দু জাতির প্রচুর ক্ষতি করেছেন। তিনি তাঁর বন্ধু কমিউনিস্টদের এই কাজে উৎসাহিত করেছেন। তারাই ইতিহাস বিকৃত করছে। তারা দেশের গৌরবের কথা সহ্য করতে পারে না। আমাদের শিক্ষিত ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীদের আমরা এ বিষয়ে সচেতন করি।

□ অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির নির্মাণকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কী চোখে দেখছে?

□ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আন্তরিকভাবে চাইছে ও প্রার্থনা করছে রামমন্দির হোক। আমাদের স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজ এজন্য ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। এর জন্য আইনি বাধা থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ করে যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরও সদিচ্ছার অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে।

□ ইদানীং কিছু ঘটনায় মনে হচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সেকুলার হওয়ার দিকে এগুচ্ছে— আপনার অভিমত?

□ আরে না না, তা নয়। হিন্দুরাই তো আসল ধর্মনিরপেক্ষ। আমরা তো হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন করি। হিন্দুদের জন্য আমি যেখানে ডাক পাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সেখানে হাজির হই।

তবে সব দিক চিন্তাভাবনা করে এগুতে হয়। আর স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের সময়কার সন্ন্যাসীমণ্ডলী দেশভাগ ও অত্যাচার দেখেছেন, এখানকার সন্ন্যাসীরা সেটা অনুভব করতে পারছেন না। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরিধি এখন বহু পরিমাণে বেড়েছে। তাই নানান চিন্তাভাবনা করতে হয়। ■

IMEX CONSORTIUM

Gopal Singh

Mob. No. +91 90513 10333

Head Office : 18, Ezra Street, Gr. Floor, Kolkata-700 001

Phone : 033-3985 1037

Branch Office : 55, Ezra Street, Yamuna Bhawan, 1st Floor, Kolkata-700 001

Phone : 033 3985 1061

Homeland : 18B, Ashutosh Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata- 700 020

Phone No. 033 6615 0017

Email : imexconsortium@gmail.com

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

একটি আন্দোলনের ১০০ বছর

শিলাদিত্য ঘোষ

‘‘আমি হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে ‘আমি হিন্দু’ জপ করাবো। এই হিন্দুত্ববোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর লুপ্ত গুপ্ত তেজোবীর্য, শক্তি-সামর্থ্য জেগে উঠবে।’’

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ।

আজ থেকে শত বছর আগে যে কথাটা বলেছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ, মনে হয় যেন আজও সেই প্রয়োজনটা সমান। তবে কি তাঁর স্বপ্ন অধরা! ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, দুর্গাপুর।

পূরণের সময় সেই প্রশ্নটা একই রকম সত্যি। আজও যে সমগ্র হিন্দু জাতিকে ‘আমি হিন্দু’ জপ করানো একান্ত জরুরি। ভারতকে অখণ্ড রাখার জন্যই জরুরি।

ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলেন আচার্য প্রণবানন্দ। তাঁর মাথাতেও এসেছিল এক দুশ্চিন্তা। বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেলেও এই দেশ কি অর্জিত স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারবে! সেই কারণেই তিনি ‘ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু পুজো-আর্চা-ধর্মকথা পাঠের জন্য তিনি সেবাশ্রম করেননি। আসলে তিনি একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সফলও হয়েছিলেন। সেই আন্দোলনটার নামই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। আজ প্রকৃত অর্থে সেই আন্দোলনের শতবর্ষ পূরণ।

কোনো আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা কখনও বিচার করা যায় না। কারণ, আন্দোলন কখনও শেষ হয় না। বিশ্বের ইতিহাসই তার সাক্ষী। প্রেক্ষিত বদলে যায়, সমাজের ছবি বদলে যায় কিন্তু আন্দোলন চলতেই থাকে, আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়।

প্রশ্ন হলো, সেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার মহান দায়িত্ব কি যথার্থ রূপে পালিত হচ্ছে?

এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার আগে বরং দেখে নেওয়া যাক স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর জীবৎকালে যে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন তার স্বরূপ কেমন ছিল। এখানে তাঁর জীবন দর্শন, তাঁর অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ, তাঁর ভাবনাকে আশ্রম গঠনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করব না। বরং আমরা দেখব ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ স্থাপনার পরেই থমকে না গিয়ে কেমন করে তিনি একের পরে এক আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। যার সুরটা ছিল এক— ‘হিন্দুজাতিকে শক্তিশালী করা’, ‘হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা’। হিন্দুজাতি যেন স্বজাতির বিপদে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সেই শক্তিতে বলীয়ান করা। কারণ প্রণবানন্দ মহারাজ মনে করতেন, শক্তিমানের সঙ্গেই শক্তিমানের বন্ধুত্ব হয়। দুর্বলের সঙ্গে নয়। ধর্মীয়ভাবে মুসলমান বা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ নয়, বন্ধুত্ব রক্ষার জন্যই হিন্দুকে শক্তিশালী হতে হবে। ক্ষাত্রবীর্যে বলীয়ান হতে হবে। তাই তিনি শুধু জাতির বিকাশ নয়, সম্প্রদায়ের বিকাশের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিকাশের কথাও বলে গিয়েছেন। সেই শক্তির মধ্যে যেমন শরীর গঠনের কথা বলেছেন তেমনই সমাজ গঠনের কথা বলেছেন। মনের মধ্যে থাকা আসুরিক শক্তির বিনাশের কথা যেমন বলেছেন, তেমনই বলেছেন সমাজের আসুরিক শক্তির বিনাশের কথা। শক্তির উপাসনা করতে বলছেন।

আজ বাংলার যে চেহারা তার অনেকটাই ছিল না বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। তখনও হিন্দুজাতি নানা ভাগে বিভক্ত। নাস্তিকদের বাদই দেওয়া গেল, আস্তিকদের মধ্যেই বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি অনেক ভাগ। তিনিই প্রথম এমন দীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এলেন যেখানে সবরকম পূজা ও বিশ্বাস পদ্ধতিও স্থান পেল। আলাদা আলাদা মন্ত্রে পারিবারিক বিশ্বাস বজায় রেখে একই ছাতার তলায় থাকার মন্ত্র দিলেন স্বামী প্রণবানন্দ। আজও সেই ধারা বজায় আছে। বলতে দ্বিধা নেই এই সময়ে দাঁড়িয়ে এক রকম নিশ্চিহ্ন

হয়েছে সেই ভেদাভেদ। এটা অবশ্যই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নামক আন্দোলনের একটা বড় সাফল্য।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সঙ্ঘের নাম প্রসঙ্গে যুগাবতার প্রণবানন্দ কী ভাবতেন সেটাও একবার জেনে নেওয়া দরকার— ''আমি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চাই, সুতরাং নামের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি সূচক শব্দ থাকা চাই। সমগ্র ভারত এই সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্র, ভারতীয় জাতীয়তার পুনর্গঠন— এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য, সুতরাং ভারত কথাটি রাখা আবশ্যক। সনাতন বৈদিক আদর্শ হবে এই সঙ্ঘের ভিত্তি, সুতরাং আশ্রম শব্দটিও বাদ দেওয়া চলবে না। জাতি-সমাজ-ব্যক্তির সর্ববিধ সেবাই সঙ্ঘের কার্য, সুতরাং সেবা কথাটিও থাকবে।"

১৯১৬ সালে তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করলেন। আর তাঁর তিরোধান ১৯৪০ সালে। মাত্র ২৪টা বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে আন্দোলনের বীজ রোপণ করলেন এবং চালিয়ে গেলেন তা আজও চলছে। বাজিতপুরের বিনোদ সাধু কলকাতাকে গড়ে তুললেন তাঁর কর্মযোগের লীলাভূমি। ১৯২২ সালে বাগবাজারের ডিসপেনসারি লেনে ছোট্ট একটা খোলার ঘরে শুরু হলো প্রথম কার্যালয়। মাসিক ভাড়া ৩ টাকা। সেখানে থেকে ব্রহ্মচারীদের নিয়ে অর্থভিক্ষা করে শুরু হলো রাজধানী কলকাতায় আশ্রমের পথ চলা। কদিন পরেই বদলে গেল ঠিকানা। এবার ১৮ টাকা মাসিক ভাড়ায় দুটি ঘর নিয়ে ১১৮ শোভাবাজার স্ট্রিটে হলো নতুন কার্যালয়। ১৯২৪ সালে কার্যালয় বদলে হলো ২৭ বউবাজার স্ট্রিটে। আবার বদল ২৬ সালে। এবার ১৬২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট। পরের বছরই ২৪/৩ মির্জাপুর স্ট্রিটে হলো কার্যালয়। সঙ্ঘের কাজ যেমনভাবে বেড়েছে তেমনই বদলাতে হয়েছে কার্যালয়।

এর পরে দরকার হলো আরও জায়গা। সেই সঙ্গে পাকাপাকি ঠিকানা। ১৯৩১ সালে বালিগঞ্জের পি ১৮, রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে ৭ কাঠা ১২ ছটাকের একটি জমি নেওয়া হলো। তখন মূল কার্যালয়ও মির্জাপুর স্ট্রিট থেকে তুলে আনা হলো এখনকার বালিগঞ্জ প্লেস ইস্টে। ৭/১ ডিহি শ্রীরামপুর লেন। সেটাও ভাড়া বাড়ি। নতুন বাড়ি তৈরি শেষ হলো ১৯৩২ সালে। ১৯২২-৩২ কলকাতায় ভাড়া বাড়ির জীবন শেষ করে প্রধান কার্যালয় স্থায়ী ঠিকানা পেল।

১০ বছরের পরিক্রমা শেষ। সেই বছরেই মানে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে গুরুপূর্ণিমার দিন আচার্য প্রণবানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে বালিগঞ্জের প্রধান কার্যালয়ে গৃহপ্রবেশ হলো। সেই সঙ্গে শুরু হলো আন্দোলনের নতুন পর্যায়। এখন এই বাড়িকেই কেন্দ্র করে দেশে এবং দেশের বাইরে প্রায় ১০০ শাখা অফিস বা আশ্রম চলছে। চলছে অগণিত সেবামূলক কেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, হাসপাতাল, ধর্মপ্রচারকেন্দ্র ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে প্রধান কার্যালয় আরও বড় হয়েছে। ১৯৬৫ সালে আশ্রম সংলগ্ন আরও ১৭ কাঠা জমি নিয়ে তৈরি হয় নতুন ভবন। এর পরে ১ বিঘা ৫ কাঠা জমির উপরে তৈরি হয় ভারতীয় সংস্কৃতি মন্দির, কর্মী আবাস। কয়েক পা দূরেই রাজা শ্রীনাথ সভাগৃহ।

এখন অনেক আধুনিক আশ্রমের ব্যবস্থা। কিন্তু আন্দোলনের প্রথম পর্ব কেটেছে এক দুঃসহ কষ্টের মধ্য দিয়ে। আর সেই কষ্টের আগুনেই যেন নিজেদের গৈরিক বসনে আগুনের আঁচ লাগিয়ে নেন সন্ন্যাসীরা। নেতৃত্বে স্বয়ং স্বামী প্রণবানন্দ।

গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে সেই সময়ে যাত্রীদের মহাবিপদের মধ্যে পড়তে হোত। পাণ্ডাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করলেন প্রণবানন্দ। গোলমাল এক সময়ে আক্রমণের চেহারা নিয়েছিল। ১৯২৪ সালে বিভিন্ন খবরের কাগজে খবর বের হয়েছিল সেই সব কাণ্ড। হামলাকারী পাণ্ডারা বুঝতেও পারেননি কতটা দৈহিক শক্তির অধিকারী প্রণবানন্দ মহারাজ। এক পাণ্ডাকে আকাশে তুলে আছাড় মারার উপক্রম হলে তারা ক্ষান্ত হয়।

বিরোধ মেটেনি তখনও। ১৯৩৭ সালে হঠাৎ বাঙালি বিদ্রোহ শুরু হলো গয়ায়। মূল রাগ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উপরে। কারণ, ততদিনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। পিতৃপক্ষে নিজে গয়ায় উপস্থিত থাকছেন প্রণবানন্দ। পাণ্ডাদের রাগ তো হবেই। জোর-জুলুম হলেই হাজির হচ্ছেন সন্ন্যাসীরা। উদ্ধার করছেন তীর্থযাত্রীদের।

আজ সেখানে ১০ বিঘা জমির উপরে বিশাল আশ্রম দেখলে সেদিনের লড়াইয়ের কথা বোঝা যাবে না। কিন্তু সেই ৩৭ সালে বাঙালি-বিহারি বিরোধ শুরু হলো। তীর্থযাত্রীদের হয়রানি বাড়তে লাগল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রিতদের নানাভাবে বাধা দেওয়া শুরু হলো। চলল আশ্রমের পুরোহিতদের মারধর। এবার আর এক প্রণবানন্দকে দেখল দেশ।

দুই বাংলা-জুড়ে এক প্রচার আন্দোলনে নামলেন তিনি। সেই সময়ে তিনি বেশ অসুস্থ। কিন্তু পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের এ মাথা থেকে ও মাথা চষে ফেললেন তিনি। শহরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে পাণ্ডাদের অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রচার শুরু করলেন। জনআন্দোলনের চেহারা নিল সেই প্রচারাভিযান। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও পাণ্ডাদের মৌরসিপাট্টা নিয়ে প্রণবানন্দের সমর্থনে নিবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করল। মিলল সাফল্য। গয়ায় বাঙালি তীর্থযাত্রীদের সমাগম অনেকটাই কমে গেল। পেটে টান পড়ল পাণ্ডাদের। শেষে তাঁরা প্রণবানন্দজীর দেওয়া শর্তই মেনে নিলেন। আজও সেই নিয়মই চলে আসছে। ভারতে এমন একটি আন্দোলনের আর এক নাম প্রণবানন্দ মহারাজ। আর তিনি নিজেই বারবার বলেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের মধ্যেই আছেন তিনি। সুতরাং একশো বছরের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সত্যিই একটি আন্দোলনের নাম।

স্বামী প্রণবানন্দ কথার থেকে কাজে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাই তাঁর লেখা বই নেই। তাঁর বাণী যেসব পাওয়া যায় তাও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথোপকথন এবং চিঠির অংশ। বক্তৃতার অংশ। আর সেই সব কথার মধ্যে বারবার উচ্চারিত হয়েছে একটি বিষয়, ব্যক্তি নয় জাতি। শুধু নিজ পরিবারের সুখ নয়, সুখী-সমাজ।

স্বামী প্রণবানন্দ বলেছেন, ''যে শুধু

সঙ্ঘের অতিথিশালা, দিল্লী।

নিজের সুখ-সুবিধা, আরাম- বিরাম নিয়া থাকে সে কি আর মানুষ! দেশের দুঃখ-দুর্দশায় যাহার প্রাণ কাঁদে না, জাতি ও সমাজের বিপদাপদে যে ব্যথা অনুভব করে না সে তো নিতান্ত জড় পদার্থ, গাছপালার সঙ্গে তাহার পার্থক্য কী?"

স্বামী প্রণবানন্দের এই ভাবনা আসলে শুধু একটা ভাবনা নয়। এও এক আন্দোলন। যে আন্দোলনের বীজ তাঁর মধ্যে ছিল সেই ছেলেবেলা থেকে। মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ায় তিনি ছিলেন সবার আগে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘও ঠিক তাই। আজও দেশের কোথাও ভূমিকম্প হলে সবার আগে কেঁপে ওঠে সন্ন্যাসীদের মন। বন্যা হলে ভেসে যায় প্রণবানন্দের আশ্রিত সন্ন্যাসীদের চোখ। যে কোনো দুর্ঘটনায় ব্যথা পান তাঁরা। আর গুরু মহারাজের দেখানো পথে চলে যান সেইসব এলাকায় পীড়িত মানুষের কাছে। সেবার ডালি নিয়ে। সত্যিই শতবর্ষের এক আন্দোলন আজ মহীরুহে পরিণত করেছে সেবাশ্রম ভাবনাকে।

লেখার গোড়াতেই একটা কথা উল্লেখ করেছিলাম। সেটি হলো প্রণবানন্দের সমাজ ভাবনা। হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ভাবনা। শক্তিশালী করার সংকল্প। আর তার জন্যই তিনি সংক্ষিপ্ত জীবৎকালেই শুরু করেছিলেন আর এক আন্দোলন। যার নাম— হিন্দু মিলন মন্দির।

এই জায়গায় তাঁর সঙ্গে মিল আরও একজনের। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরামরাও হেডগেওয়ার। তাঁরও দুশ্চিন্তা ছিল ভারত তার অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে তো! একই ভয় পেয়েছিলেন প্রণবানন্দও। দু'জনেই সেই আশঙ্কা থেকে রক্ষা পেতে দুটি পৃথক কিন্তু একই লক্ষ্যের ব্যবস্থা। ডাঃ হেডগেওয়ার গড়লেন প্রাত্যহিক মিলনকেন্দ্র 'শাখা'। আর প্রণবানন্দ গড়লেন প্রাত্যহিক মিলন কেন্দ্র— 'হিন্দু মিলন মন্দির'। জাতিকে রক্ষার জন্যই আলাদা নামে হলেও দু'জনেই 'রক্ষীদল' গড়ার সংকল্প নিলেন কাছাকাছি একই সময়ে। সেই রক্ষীদলকে ক্ষাত্রবীর্যে বলীয়ান করার মন্ত্র দিলেন দু'জনেই। দুই কালজয়ীর মত ছিল এক— হিন্দু জাতির নৈতিক শক্তির ভিত আরও শক্তিশালী করতে হবে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় প্রণবানন্দ বলেছিলেন, "বৌদ্ধ সঙ্ঘের পরে এই আড়াই হাজার বছরের মধ্যে সঙ্ঘ কী জিনিস তাহা ভারতবর্ষ জানে না।... আমার সঙ্ঘ হইবে দ্বিতীয় বুদ্ধের সঙ্ঘ।"

তিনিই বলেছেন— "আমি দেখিয়ে দেব হিন্দুর ধর্ম শক্তির সাধনা। হিন্দুর সাধনা— বীর্যের সাধনা।"

তাই তো চালু করলেন শস্ত্র পূজন। ত্রিশূল, তরবারি দিয়ে পূজা। বীর ভাবোদ্দীপক পূজা। সেই ভাবনা থেকেই তৈরি হয় 'হিন্দু মিলন মন্দির'। আর এই আন্দোলন শুরু হতেই সেই সময়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। তা টেরও পেয়েছিলেন প্রণবানন্দ। বলেছিলেন— "যেইমাত্র বলেছি হিন্দু সমাজ সমন্বয় আন্দোলন, হিন্দু রক্ষীদল অমনি দেশশুদ্ধ লোকের কান খাড়া হয়ে উঠেছে।... কোনখানে আঘাত দিলে জাতির প্রাণে সাড়া জাগবে, আমি তা ভাল করেই জানি।"

সঙ্ঘনেতা প্রণবানন্দ হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় বললেন,—"আমার হিন্দু মিলন মন্দির কোনো ইট কাঠ পাথরের মন্দির নয়। হিন্দু সমাজের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, খণ্ড-বিখণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে একত্র জোড়া দিয়ে হবে আমার হিন্দু মিলন মন্দির।"

কোথাও কোনো হিন্দু বিপদে পড়লে, হিন্দু মন্দির কলুষিত হলে, বিগ্রহ লাঞ্ছিত হলে হিন্দুর উপর আঘাত এলে তার বিরুদ্ধে সরব হবে হিন্দু মিলন মন্দির। শুধু পূজা-পাঠ নয়, হিন্দুকে হিন্দুর পাশে দাঁড় করানোর লক্ষ্যেই স্থাপন করেছিলেন এমন এক মন্দির নামের আন্দোলন।

সেই আন্দোলনকে যদি সংখ্যার বিচারে ভাবা হয়, তবে তা আজ সফল। দেশের শহরে শহরে গড়ে উঠেছে হিন্দু মিলন মন্দির। শত শত মন্দির। বড় বড় বাড়ি। তাকে কেন্দ্র করে বছরে বছরে মহোৎসব। চলছে হাসপাতাল, স্কুল, ছাত্রাবাস, অ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু সেটাই কি শুধু লক্ষ্য ছিল? জাতি গঠনের সংকল্প কোথায় গেল? হিন্দুর বিপদে হিন্দুর পাশে দাঁড়ানো, হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করার, ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ গঠনের উদ্যোগ আছে তো!

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আনন্দের মধ্যে এই প্রশ্নটুকু, কাঁটা হয়েই থাকুক না হয়।

কোনো আন্দোলন তো প্রশ্নাতীত হয় না। আর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ মানে তো এক বিশাল আন্দোলন, যার শেষ নেই।

(লেখক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একজন অনুরাগী)

হিন্দুর প্রাণকেন্দ্র বারাণসী
কিছু কথা, কিছু ব্যথা

স্বামী ব্রহ্মময়ানন্দ

বিশ্বের প্রাচীনতম তীর্থস্থান কাশী বা বারাণসী। কথিত আছে এই পবিত্র তীর্থ ভগবান দেবাদিদেব শূলপাণির ত্রিশূলের উপরে অবস্থিত। যার পূর্ব প্রান্তে অর্ধ চন্দ্রাকারে প্রবাহিত উত্তরবাহিনী মাতা ভগবতী গঙ্গা। তারই তীরে অবস্থিত ধ্যানমগ্ন দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের আসন। এখানে তিনি বিশ্বনাথ রূপে বিরাজিত। সমগ্র বিশ্বজীবের ক্ষুধা নিবারণকারিণী মাতা অন্নপূর্ণা স্বয়ং এখানে উপস্থিত থেকে প্রত্যহ বিশ্বজীবের ক্ষুধা নিবারণ করে চলেছেন। বরুণা ও অসি নদীর মধ্যবর্তী এই সেই মহাতীর্থ বারাণসী বা কাশী। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের সমস্ত মত-পথের দ্রষ্টা-স্রষ্টা সাধু-সন্ত মহাপুরুষ, অবতার পুরুষ, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকলেরই পদার্পণ ঘটেছে মোক্ষভূমি ও জ্ঞাননগরী এই কাশীধামে। আর তার প্রমাণস্বরূপ শত শত মঠ-মন্দির তাদের শাখা স্থাপন করে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছেন এই নগরীকে। অপর দিকে এই পবিত্র ভূমির সংস্পর্শে ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ হয়েছেন তাঁরা।

শিব পুরুষ শঙ্করাচার্যের জীবন লীলা পর্বেও কাশীধাম একটি বিশেষ স্থান আধিকার করে রয়েছে। তেমনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের জীবনলীলায় মহাভাগবতী শক্তির বিকাশ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই কাশীধামের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯১৩ সালে গোরক্ষপুর মঠের তৎকালীন মহন্ত যোগীরাজ বাবা গম্ভীরানাথজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে চলে আসেন কাশীধামে। অসি ঘাটের একটি পরিত্যক্ত নির্জন বাড়িতে বেশ কিছু দিন কঠোর তপস্যায় ব্রতী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন সমাজকল্যাণকার্যে রত হলেন তখন, সেই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে যতদিন তিনি লীলা শরীরে (১৯৪১ সাল) বর্তমান ছিলেন ততদিন পর্যন্ত প্রতি বৎসর এই কাশীধামেই তিনি দুর্গা পূজার মহাপর্ব ও সন্ন্যাসী মহাসম্মেলনের আয়োজন করতেন (১৯৩৩-৩৪ সাল বাদে)। এমনকী সঙ্ঘ আজ পর্যন্ত তারই প্রদর্শিত সেই পথকেই অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। আর তারই সুবাদে প্রতি বৎসর অধিকাংশ সঙ্ঘ সন্ন্যাসীগণ কাশীধামে সম্মিলিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন।

৪ অক্টোবর ২০১৫ সন্ধ্যায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় থেকে সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজের নেতৃত্বে অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সেবক ও একটি চারণ দল আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর আসন ও প্রতিকৃতি নিয়ে পিতৃপক্ষের মেলার জন্য গয়াতে রওনা হন। গয়ার পিতৃপক্ষের মেলার শেষে ওই চারণ দলটি দুর্গাপূজা উপলক্ষে কাশীধামের উদ্দেশে রওনা হন। আর এই প্রতিবেদক ওই দলেরই একজন সদস্য ছিল। সঙ্ঘের রীতি অনুসারে গুরু মহারাজের আসন কাশীধামে পৌঁছনোর পরই প্রতিটি চারণদল তাদের নির্ধারিত এলাকাগুলিতে দুর্গাপূজা ও হিন্দু-ধর্ম শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্মেলনের নিমন্ত্রণ করা ও কিছু আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য বেরিয়ে পড়েন। ভেলুপুরা, তিলভাণ্ডেশ্বর বাঙালি বস্তি, এই সমস্ত অঞ্চলে আমাদের চারণ দলটি গিয়েছিল। আর এখানকারই একটি ছোট্ট ঘটনা আমাকে বড় ব্যথিত করেছিল।

রেওয়াড়িতলার ডান পার্শ্বের গলি দিয়ে এগিয়ে চলেছি। দেখি হিন্দি, বাংলা, ইংরেজিতে লেখা আছে 'আর্য বিদ্যা নিকেতন।' গেট পেরিয়ে ভিতরে গিয়ে দেখি ছোট্ট একটি শিবমন্দির। আর পাশের মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত প্রতিষ্ঠিত দশভুজা দেবি মূর্তি। তারই পাশে সুন্দর কাঠের সিংহাসনে এক সাধু-মহারাজের প্রতিকৃতি যাঁর নাম বিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারী। জানতে পারলাম তিনিই এই মন্দিরগুলি তৈরি করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি একটি ট্রাস্ট গঠন করে এই সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা সেই ট্রাস্টি বোর্ডকে অর্পণ করেন। এই মন্দিরটি বর্তমানে যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি বললেন, আনুমানিক ১৯৩০-এর খৃষ্টাব্দের কোনো এক সময় এই মন্দিরটি তৈরি হয়। এই বিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারী ইহলোক ত্যাগ করার পর অন্য একজন ব্রহ্মচারী এখানে থাকতেন। পরবর্তী তিনিও যখন দেহ রাখেন তখন সমস্ত দায়িত্ব ওই ট্রাস্টি বোর্ডের উপরেই বর্তায়। ইদানীং জানা গেল, এই সম্পত্তি নাকি পার্শ্ববর্তী মুসলমানকে বিক্রি করে দিয়েছেন কলকাতায় বাসকরা পরবর্তী ব্রহ্মচারীর ভ্রাতুষ্পুত্ররা। বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ তার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা : তিলভাণ্ডেশ্বরের কাছে একটি বাড়ির সিঁড়িতে একজন মহিলাকে উঠে যেতে দেখলাম। বুঝলাম তিনি হিন্দু মহিলা কিন্তু আমি যখন কলিংবেল বাজালাম তখন উপর থেকে একজন মুসলমান ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে বললেন 'ক্যায়া চাহিয়ে'। আমি অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আমি বললাম 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সে আয়্যা হ্যায় দুর্গা পূজা কে লিয়ে। সে বলল 'ইহা কুছ নেহি'। আমি অন্যত্র চলে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে একজন হিন্দু দোকানদারকে এই কথাটি বললাম। তিনি অনেকটা রাগত স্বরেই আমাকে বোঝালেন, 'মহারাজ বানারঁস মে এ্যয়ছা বহুত হ্যায়। এক তরফ্ হিন্দু তো দুসরে তরফ্ মুসলমান। ইস্ মকান তো বাঙালি দাদাকে থা, আউর জাদা প্যয়সা লেকর মুসলমানোকে পাস বেচ্ দিয়া'। সামনে এগিয়ে যেতেই এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

থেকে এসেছি জেনে ৫০ টাকা দিলেন। আমি রশিদ দিতে তিনি বললেন, স্বামীজী! হিন্দুদের জন্য আপনারা কিছু করুন, চারিদিকের পরিস্থিতি ভালো নয়। আমি বললাম, কেন কী হয়েছে? তিনি বললেন, আমাদের বিল্ডিংয়ে ঢুকতেই দুটো মুসলমান পরিবার বড়ো উৎপাত করে। যেখানে যত হিন্দুর সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে বেশি পয়সা দিয়ে ওরা তা কিনে নিচ্ছে। এই সময়ে আমাদের নেতা স্বামীজী এসে গেলেন। তখন আমরা প্রচার শেষ করে চারণদল নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম। মহাষষ্ঠীর দিন বিকেলে শতাধিক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী স্বধর্মপ্রেমী শতশত ভক্ত, হাতি, ঘোড়া, উট, বহু সংখ্যক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শ্রীমৎ আচার্যদেবের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে প্রতিমা আনয়ন করা হলো। মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী ও দশমীর পূজা মহাধুমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হলো। হাই কোর্টের অর্ডার, গঙ্গায় মূর্তি বির্সজন নিষিদ্ধ তাই প্রশাসনের তৎপরতায় ও তাদের নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিমা বিসর্জন করা হলো। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রথা অনুযায়ী গঙ্গাবক্ষে বজ্‌রা নৌকার উপর বিজয়া সম্মেলন ও শ্রীশ্রী দুর্গামায়ের এবং শ্রীশ্রী গুরুমহারাজের পূজা আরতি সম্ভব হলো না। তাই এক প্রকার নিরানন্দ ও বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়ে পরবর্তী দিনগুলি কাটল। মহরমের দিন মঙ্গলারতির পর স্বামী গৌতমানন্দ ব্রহ্মচারী, সুশান্ত ও আমি গেলাম গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ দর্শনের মানসে। কয়েক শত মুসলমান কার্যত গোধুলিয়ার মোড়টিকে অবরোধ করে অবস্থান করে আছে, তা দেখে সে দিনের ওই বাঙালি ভদ্রলোকের কথাগুলি স্মরণে এলো। স্মরণে এলো ইতিহাসের পাতায় লেখা দিনগুলি, আর অদূর ভবিষ্যতের এক অজানা আশঙ্কায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। পরদিন আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম, কলকাতায় ফিরে এসে আমার সেই ভারাক্রান্ত মনকে হাল্কা করবার জন্য মনে হলো কিছু লিখার প্রয়োজন।

বস্তুত বারাণসীতে আমি যা শুনেছি বা দেখেছি তা শুধু বারাণসী নয়, ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে অহরহ ঘটে চলেছে। আর এজন্য দায়বদ্ধ ভারতবর্ষের আপামর হিন্দু জনসাধারণ। সুদূর অতীতে দেশীয় রাজন্যবর্গের যে ইতিহাস জানতে পারা যায় সেখানে পরাজিত সকলেই হিন্দু। বিধর্মী, বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি। বারবার বিদেশি-আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে আমাদের দেশ আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি। সেই অপমান আজও অব্যাহত। বর্তমান আমাদের এই ভারত রাষ্ট্রের পরিচালনা ও আইন প্রণয়নকারীগণ অধিকাংশ হিন্দু। সেই আইনকে কার্যকরী যারা করবেন তারা সকলেই প্রায় হিন্দু। আর যাদের উপর কার্যকারী হবে তারা সকলেই হিন্দু। তবু হিন্দু অপমান অহরহ হয়ে চলেছে। তাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহান প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলতেন— 'হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে, নাই কেবল সংহতি শক্তি। এই সংহতি শক্তি জাগাইয়া দিলে হিন্দু জগতে অজেয় হইয়া দাঁড়াইবে।' সত্যি যুগ যুগ ধরে কত মহাপুরুষরা এসেছেন, সকলেই নিজ নিজ তপস্যালব্ধ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সমগ্র হিন্দু সমাজের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আচার্য শঙ্কর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো কতিপয় মহামানবেরাই চিন্তা করেছেন। স্বামী প্রণবানন্দজী বলতেন, 'মিলন হয় সমানে সমানে, সবলে দুর্বলে কখনই মিলন সম্ভব নয়। খৃষ্টান ও মুসলমান সুগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ, তাই আমাদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।'

স্বধর্মপ্রেমী সকল ভাই-বোনদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমাদের ঋষিরা বলেছেন— 'ধর্মঃ রক্ষতি রক্ষিতঃ' অর্থাৎ যিনি নিজ ধর্মকে শ্রদ্ধা পূর্বক পালন ও রক্ষা করেন, তদ্রূপ ধর্মও তাকে পালন ও রক্ষা করে থাকে। তাই সকল মত-পথ, জাত-পাত ভুলে, আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতার বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলে, হীন রাজনৈতিকতার উর্ধ্বে উঠে আমরা আমাদের ধর্মকে রক্ষা করি। বিশ্বশ্রেষ্ঠ এই সনাতন ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করে তার তলে সকলে সমবেত হই। এটাই একমাত্র পথ। নান্যঃ পন্থাঃ।

(লেখক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আদর্শপল্লী, মুলুক, বোলপুর, বীরভূম

১৯৯৮ সালে শুরু হয় এই আশ্রম। স্বামী সঙ্ঘমিত্রানন্দজীর (শান্তি মহারাজ) অভাবনীয় প্রচেষ্টা এবং পরিচালনায় বর্তমানে প্রায় ১০০ বিঘা জমির উপর চলছে বিশাল সেবামূলক কর্মকাণ্ড। শুধু বোলপুরবাসী নয়, শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছেও এই কর্মভূমি এক অনুপ্রেরণাস্বরূপ।

* আই. টি. আই. (ভারত সরকারের NCVT অনুমোদিত)।

ITI Trade–Electrician, Fitter, Plumber, COPA, DTP.

* প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির * ছাত্রাবাস (২৭০ জন)

* বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : তাঁত, টেলারিং, নিটিং ইত্যাদি।

* কম্পিউটার এবং স্পোকেন ইংলিশ শিক্ষা।

* ভ্রাম্যমান অ্যালোপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়।

* গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র * অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা।

* গোশালা ও জৈবিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ। * অতিথি নিবাস।

দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে (১৯৪৩-৪৪)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ড. সুব্রত বিশ্বাস

১৯৪৫ সালে প্রকাশিত দুর্ভিক্ষ কমিশনের মতে দক্ষিণবঙ্গে ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাসের (১৯৪২ সালের ১৬ অক্টোবর) প্রভাব কাটার আগেই রাজ্য জুড়ে দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩-৪৪) করাল ছায়া নেমে আসে। এর একটি কারণ প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা। তবে, কেবল প্রকৃতি-ই নয়, দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ মানুষের অশুভ শক্তি; মনুষ্য সৃষ্ট কারণ পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য প্রধান দায়ী। ১৯৪৩ 'দুর্ভিক্ষের নগ্নমূর্তি' শীর্ষক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উল্লেখিত 'দুর্ভিক্ষের প্রথম ও প্রধান কারণ ইংরেজ, দ্বিতীয় ও গৌণ কারণ প্রলয় ঝঞ্ঝা।' স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক লেখেন 'এই মর্মান্তিক দুর্যোগ মনুষ্যসৃষ্ট। ভারতবর্ষের বিগত দুর্ভিক্ষগুলি মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দেখা দেয়। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ কোনো জলবায়ু বিপর্যয়ে ঘটেনি; পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে।' সমাজতত্ত্ববিদদের ইদানীং বহু ভাবনা চিন্তায় এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়।

কারণ যাই হোক, সংখ্যাহীন মানুষের মৃত্যু এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব রাষ্ট্র কমিশন অর্থাৎ সরকার কোনো মতেই এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের দুর্দশার প্রতি সরকারের সহানুভূতি ছিল না; ছিল চরম ঔদাসীন্য এমনকী দুর্ভিক্ষে সরকার বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিল। জনমতের চাপে পড়ে সরকার বিলম্বিত, অপর্যাপ্ত ও পক্ষপাতভাবে কিছু কিছু দুর্গত সাহায্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙে। বিপরীতে বেসরকারি সংগঠনগুলি আন্তরিকভাবে আর্তত্রাণে এগিয়ে আসে। এদের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শাখাগুলি (মিলন মন্দির) সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের (বালিগঞ্জ, কলকাতা) নিকট ক্রমাগত চিঠি লেখে। তাদের চিঠিপত্রে স্থানীয় অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাবের যে সব ঘটনা জানা গিয়েছিল এবং এ সম্পর্কে সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী ও স্বামী বিরজানন্দজী ফরিদপুর, খুলনা, বগুড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা সত্যই মর্মন্তুদ। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সঙ্ঘের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হতে জ্যৈষ্ঠ মাস (১৩৫০ সন) হতে ত্রাণ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বাজিতপুর (ফরিদপুর) কেন্দ্র থেকে উপবাসক্লিষ্ট অসহায় নরনারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য ১৩৫০ সন ১ আষাঢ় থেকে খাদ্য (খিচুড়ি) বিতরণ করা হয়। সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ এই কেন্দ্রে গিয়ে জনসাধারণের অত্যধিক দুঃখ দুর্দশা দেখে খাদ্য বিতরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। শুধু বাজিতপুর নয়, অসংলগ্ন অঞ্চলের উপবাসক্লিষ্ট পল্লীবাসীদের মধ্যেও খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ৯০০০ নরনারী ও শিশুকে খাদ্য দেওয়া হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসেও পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে খাদ্য দেওয়া হয়। এছাড়া শ্রাবণ মাসের শেষে যেসব মহিলারা বস্ত্রাভাবে ঘরের বাইরে আসতে পারছিল না তাদের জন্য বস্ত্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে শিশুদেরও জামা কাপড় দেওয়া হয়।

১৩৫০ সনের চৈত্রমাসের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সঙ্ঘের বাজিতপুর প্রণব মঠ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে সাপ্তাহিক চাল বিতরণ করা হয়। সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় থেকে এই কেন্দ্রে ২০০ মণ চাল পাঠানো হয়। ১৩৫১ সনের আষাঢ় মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাজিতপুর কেন্দ্র থেকে বাজিতপুর, নিজবাজিতপুর, কেন্দুযা, নেবুতলী, কিসমতদী, শ্রীনন্দী, গদ্দাবদ্দা, সুতারকান্দী, নয়া কান্দা, চৌরাশী প্রভৃতি ১৫টি গ্রামের ১৫০টি পরিবারের মধ্যে সপ্তাহে ৮ মণ চাল বিতরণ করা হয়।

১৩৫০ সনের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত ১৯ সপ্তাহ যাবৎ এই কেন্দ্র থেকে

ত্রাণ বিতরণে সঙ্ঘের সন্ন্যাসী মহারাজ (ফাইল চিত্র)।

১০টি গ্রামের ৩১০ জন দুঃস্থ মহিলাকে প্রতি সপ্তাহে ৯ মণ হিসাবে চাল দেওয়া হয়। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে দৈনিক ৩০০ শিশু ও মহিলাকে দুধ দেওয়া হয়।

১৩৫১ সনের ভাদ্র আশ্বিন মাসে মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের অন্নকষ্টের সঙ্গে ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগ-ব্যাধি সংক্রমণ রূপে দেখা দেয়। সঙ্ঘের তৎকালীন যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে বাজিতপুর গ্রামে দু'জন অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা দাতব্য চিকিৎসালয় খোলেন। ডাক্তার এবং সঙ্ঘের কর্মীরা প্রত্যেক গ্রামে গিয়ে রোগীদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করেন। ১৩৫১ সনের অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই কেন্দ্রের দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে রাজের ও মাদারিপুর থানার অন্তর্গত ৩০টি গ্রামের ম্যালেরিয়া আক্রান্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদের নিয়মিত ওষুধ ও পথ্য বিতরণ করা হয়।

কলকাতার নিকটবর্তী পল্লী অঞ্চল থেকে আগত অনশন পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য সঙ্ঘ হতে এই সময়ে বালিগঞ্জেও একটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়। সমস্ত দিন চেষ্টা করেও যারা কোনো প্রকারে আহার সংগ্রহ করতে পারছিল না, সন্ধ্যার প্রাক্কালে এরূপ ৫০০ অসহায় মহিলা ও শিশুদের আহার দেওয়া হয় ১৩৫০-এর আষাঢ় মাসে। পরের মাসে এই কেন্দ্র থেকে দৈনিক ১ হাজার লোককে আহার দেওয়া হয়। এছাড়া কসবা অঞ্চলের অনশনক্লিষ্ট ৫০টি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় ২০০ লোককে দৈনিক নিয়মিত আহার দেওয়া হয়। ১৯৪৩-এর জুলাই ও আগস্ট এই দুই মাসে প্রায় ৪০ হাজার নরনারী খাদ্য পেয়েছিল।

কলকাতা ফুটপাথে অনাহারক্লিষ্ট রোগীদের নিয়মিত ওষুধ ও পথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হয়। অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাঃ গোপীকৃষ্ণ সিংহ প্রতিদিন সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে এসে এই সমস্ত রোগীর চিকিৎসা করতেন। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এই কার্যে সহায়তা করেন। এই সময়ে ফুটপাথের শিশু ও রোগীদের দুধ ও বার্লি দেওয়া হয়েছিল।

স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মিলন মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী বিরাজনন্দজীর উদ্যোগে কুমিল্লা শহরে ১৯৪৩-এর জুলাই মাস থেকে একটি কেন্দ্র থেকে নিরন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের কার্য আরম্ভ হয়। পল্লী অঞ্চল থেকে আগত ৩০টি এবং শহরের ৫০টি সহ মোট ৮০টি পরিবারের ৪০০ অসহায় নিরন্ন মানুষকে প্রথম সপ্তাহে ১৫ মণ চাল সাহায্য করা হয়। আগস্টের মাঝামাঝি শহরের ৬০টি দুঃস্থ পরিবার ও গ্রাম থেকে আগত ৬০টি পরিবারকে নিয়মিতভাবে সাহায্য করা হয়। এছাড়া শালধর, পাঁচমুখী, মীরপুর, ধনঞ্জয়, বাঁশমঙ্গল, খায়েরা প্রভৃতি গ্রামের ৫০টি দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করা হয়। এছাড়া মহিলাদের বস্ত্র, শিশুদের জামা ও রোগীদের বার্লি দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে এই কেন্দ্রে সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬০০।

১৯৪৩-এর জুলাই মাস থেকে ১৯৪৪-এর মার্চ মাস পর্যন্ত কুমিল্লার শাখা কেন্দ্র হতে কুমিল্লা ও পার্শ্ববর্তী ২৫টি গ্রামে ত্রাণকার্য পরিচালিত হয়। এই ত্রাণকার্যে ৮০০ মণ চাল, ২০০ মণ ধান, ৫০ মণ ডাল, ৬০০টি কাপড়, ৫০০টি কম্বল, ২০০টি জামা ও প্যান্ট বিতরণ করা হয়। এছাড়া সরকার থেকে প্রাপ্ত ৫০ মণ বাজরা, ৩০ মণ আটা ১৬০০টি কাপড়, ৫৫০টি কম্বল ও ১০০টি চাদর কুমিল্লা শহর এবং জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিতরণ করা হয়। প্রতিদিন ১৫০ জন দুঃস্থকে কুমিল্লা শহরে সাহায্য দেওয়া হয়। ওরাইল, বরদেন, বরদিয়া, খায়েরা, বাঁশমঙ্গল, বকশিমুল, লক্ষ্মীপুর, কাঞ্চনপুর, শালুকুমড়ো, তৈলকূপী প্রভৃতি মিলন মন্দিরে ২০০ কম্বল, ২৮০টি কাপড়, ৭৫০০ ম্যালেরিয়া নাশক বড়ি এবং ৩৮ পাউণ্ড কুইনাইন বিতরণ করা হয়। ত্রাণকার্য পরিচালিত করার জন্য সরকার হতে কন্ট্রোলদরে ১৩০০ মণ চাল ক্রয় করা হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসের শেষ থেকে ১৯৪৪ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত সংগৃহীত চাল, ধান, গম, বাজরা, ডাল, জামা, কাপড়, কম্বল, ওষুধ, পথ্য এবং নগদ টাকার অধিকাংশই ১১ মাসে ব্যয় করা হয়।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সঙ্ঘের কর্মকেন্দ্র খুলনা ও আশাশুনী সেবাশ্রমে দুটি খাদ্য বিতরণকেন্দ্র খুলে বেলফুলিয়া, রাজপুর, দেয়ারা, নন্দনপুর, আইসগতি প্রভৃতি খুলনা শহরের নিকটবর্তী এবং সুন্দরবন অঞ্চলের আশাশুনা, মুদ্রা, বাউশুলা, গুরগুড়া, তুষখালি, জেলেখালি, বলাবাড়ী প্রভৃতি ১২টি গ্রামের ৫০০ নরনারী ও শিশুর আহারের ব্যবস্থা করা হয়।

সেবাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় হতে অনশনক্লিষ্ট ও ব্যাধিগ্রস্তদের নিয়মিত ওষুধ, বার্লি এবং শিশুদের দুধ দেওয়া হয়। ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত আশাশুনী কেন্দ্র থেকে ১৫ হাজার নরনারী সাহায্য পায়। প্রায় ৩০০ মহিলা ও শিশুকে জামা-কাপড় দেওয়া হয়।

খুলনা জেলার আশাশুনী থানার অন্তর্গত মিত্রতেতুলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের খাদ্যাভাব দূর করার জন্য সঙ্ঘ হতে মিত্রতেতুলিয়ায় একটি সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করে (১৩৫১ বর্ষাকাল) ৫০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে দৈনিক এক পোয়া হিসাবে চাল সাহায্য করা হয়।

হাসনাপুর মিলন মন্দিরের সভাপতি ও কালিকাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট উকিল ক্ষেত্রমোহন মণ্ডলের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় ২৬ মে (১৯৪৩) একটি চিপগ্রেন সেন্টার খোলা হয়। এতে সাউথ গড়িয়া ইউনিয়ন বোর্ডের ২৮টি মৌজার ১ হাজার দুঃস্থ ব্যক্তি সস্তায় চাল, চিনি ইত্যাদি কিনতে পারে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২৫০০ মণ চাল, ১০০ মণ আটা, ১৩৭ মণ চিনি ও ১৬২০ জোড়া ধুতি ও কাপড় সস্তায় বিতরণ করা হয়। মিলন মন্দিরের নারায়ণী সেনাদলের ৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবক এই কার্যে সহযোগিতা করে।

সঙ্ঘের ঢাকা জেলার ত্রাণকার্যের ভারপ্রাপ্ত স্বামী সুদ্ধানন্দজী ২৩.১.৪৪-এ জেলার বিভিন্ন গ্রামের দুঃস্থদের কাপড় ও কম্বল বিতরণ করেন। এই সময়ে কয়েকটি গ্রামে ম্যালেরিয়ানাশক বড়ি বিতরণ করা হয়।

১৩৫১ সনের আষাঢ় মাসের হিসাব অনুযায়ী এই জেলার যশলং ইউনিয়নে ১টি কেন্দ্র খুলে বামিয়া, সেরাজাবাদ, নয়না, পুরা, যশলং, হাটখানা, দরজার, বায়হাল, ছোটোকেওয়ার ও নয়াকান্দি এই দশটি গ্রামের

এবং কামারমারা ইউনিয়নে আরো একটি কেন্দ্র খুলে দিঘিরপাড় ও সুলচর গ্রামের ৪৪০ জন দুঃস্থের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ১৯ মণ চাল বিতরণ করা হয়।

১৯৪৪-এর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকা জেলার রায়পুর, যশোর কেন্দ্র থেকে ৪৪টি গ্রামের ২০০০ রোগীর মধ্যে ১২০০০ কুইনাইন ও মেনাক্রিন ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

১৩৫১ সনের আশ্বিন মাসে ঢাকার পাউলদিয়াতে একটি করে ১২টি গ্রামে প্রতি সপ্তাহে চাল, কাপড় ও ওষুধ দেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা জেলার এই কেন্দ্র থেকে প্রতি সপ্তাহে ৩৫ মণ চাল, প্রত্যহ ৫ সের গোরুর দুধ দেওয়া হয়। এছাড়া শীতের প্রারম্ভেই দুঃস্থ নরনারীকে ৭০০ কাপড় ও ৪০০ জামা এবং ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩০০০ মেনাক্রিন ট্যাবলেট ও ৩০০০ ম্যালেরিয়ানাশক বড়ি বিতরণ করা হয়।

১৩৫১ সনের শুরুতে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মহামারী ও অন্নকষ্ট ভয়াবহ আকার ধারণ করলে সেখানকার নরনারীরা অবর্ণনীয় দুর্দশায় পতিত হয়। তাদের সাহায্যার্থে বাসিয়ায় ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করে যশলং ও কামারমারা ইউনিয়নের ১২টি গ্রামে ৪ মাসে (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন) ৪০০ মণ চাল, জামা, কাপড়, ম্যালেরিয়ানাশক বড়ি ও বার্লি বিতরণ করা হয়।

১৯৪২ সালের ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলায় ঝড়-বন্যার পর নভেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত গেওখালিতে প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র এবং সুতাহাটা থানার ৯নং ১০নং ইউনিয়নে যথাক্রমে হোরখালি ও দুর্গাচকে বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করে মোট ২১+১৫=৪৬টি গ্রামে নিরবচ্ছিন্নভাবে ত্রাণকার্য সংগঠিত হয়। হোরখালি গ্রামকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী ৩০টি গ্রামে ওষুধ ও পথ্য দেওয়া হয়। ১৯৪৪-এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মোট ৬৩৪৬ জনকে ওষুধ ও ১৩০ জনকে পথ্য দেওয়া হয়। এই সময়ে একইভাবে ২৪ পরগনা জেলার শিবকালীনগর ও পাথরঘাটায় ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হয়।

১৯৪৪-এর জুলাই মাসের প্রথমভাগে সঙ্ঘ সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী সঙ্ঘের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা ও দৌলতগঞ্জ হয়ে নোয়াখালি জেলার পল্লী অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তিনি শ্রীপুর গ্রামে ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করে বিভিন্ন মিলন মন্দিরের অন্তর্গত সভ্য ও রক্ষীদের সাহায্যে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের চাল, কম্বল, কুইনাইন ট্যাবলেট, গুড়ো দুধ ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ দিনগুলিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বাংলায় ১৬টি জেলায় (১৯৪৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল ১১টি জেলা) দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থে সঙ্ঘ যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছিল তা হলো :

১। মোট ৮টি কেন্দ্র থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে চাল, ডাল, আটা বিতরণ। (সাপ্তাহিক)

২। ৭টি কেন্দ্র (অন্নসত্র) থেকে প্রতি সপ্তাহে বুভুক্ষু নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়।

৩। ১৪টি কেন্দ্র থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত রোগী ও শিশুদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ (১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে মোট কেন্দ্র হয় ২০টি)।

৪। মোট ২৮টি স্থায়ী কেন্দ্র থেকে ওষুধ ও পথ্য বিতরণ (১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে এর সংখ্যা হয় ৫১টি।)

৫। ৩৯টি কেন্দ্র থেকে কাপড়, কম্বল, চাদর ও জামা প্রদান (১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে এর সংখ্যা হয় ৪৫টি)।

৬। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য প্রদান (দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিল এরূপ ৬০টি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ত্রাণকার্যে সহায়তা করা হয়)।

১৯৪৩-এর জুলাই-আগস্ট মাসে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির মাঝে দামোদর ও অজয় নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর নেতৃত্বে একদল উপযুক্ত কর্মী বিধ্বস্ত অঞ্চলে ২২টি গ্রাম পরিদর্শন করে দুর্গতদের মধ্যে প্রাথমিক সাহায্যস্বরূপ চিড়ে ও গুড় বিতরণ করেন। এছাড়া কর্মীগণ নৌকা করে নিরাশ্রয় নরনারী ও শিশুদের গাছ ও খড়ের চালের ওপর থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন। দুর্গতদের মধ্যে জামা, কাপড়, দুধ, বার্লি এবং ওষুধও বিতরণ করা হয়। এমনকী বিধ্বস্ত অঞ্চলে ১০০টি গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ১৯৪৩ সালের জুন মাস থেকে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ পথ্যাদি প্রদানের মাধ্যমে ত্রাণকার্যের ধারাবাহিকতা ঠিক রেখেছিল। এক্ষেত্রে দেশবাসীর নিকট বিভিন্ন সময়ে সাহায্যের যে আবেদন করা হয়েছিল তাতে যারা সাড়া দিয়েছিল, তাদের অকৃপণ দানে সঙ্ঘের ত্রাণ তহবিল তৈরি হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য দানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

১। সর্বভারতীয় হিন্দু আর্যধর্ম সেবাসঙ্ঘ ৪ হাজার টাকা (মেদিনীপুরে বস্ত্র বিতরণের জন্য ১ হাজার ৫০০ টাকা, বর্ধমানের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গৃহনির্মাণের জন্য ৩০০ টাকা ও বস্ত্র বিতরণের জন্য ২২০০ টাকা)।

২। রেড ক্রস সোসাইটি— জমানো দুধ ১৪৪ কৌটা।

৩। লিলি বিস্কুট কোম্পানি—বার্লি ২৫ পাউণ্ড।

৪। ঢাকেশ্বরী কটন মিল—১৫০ খানা ধুতি ও শাড়ি এবং লংক্লথ ৫০ গজ।

৫। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী—৫০০ টাকা।

৬। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি— ২০০০ টাকা, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক বড়ি— ৩৭০০।

৭। লক্ষ্মী জুট মিল—১ হাজার গজ হেসিয়ান ক্লথ।

৮। সোনাপট্টি ব্যবসায়ী সমিতি— ১৫০ খানা কম্বল।

৯। খুলনা-যশোর সেবা সমিতি— ৩০ মণ চাল ও ৪৫০ টাকা।

বাংলায় দুর্ভিক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তার সাধ্যমতো চাল, কাপড়, কম্বল, দুধ ও ওষুধ পথ্যাদি দ্বারা লক্ষ লক্ষ আর্ত নরনারী ও শিশুর সেবা করতে ত্রুটি করেনি। প্রয়োজন নিঃস্ব জনগণের স্থায়ী বাসস্থান ও স্থায়ী

জীবন-যাপন প্রণালীর উপায় নির্ধারণ ও ব্যবস্থা। এর জন্য কৃষি ও কুটীর শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন। দেশের শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নও একই সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ত্রাণকার্যকে গঠনমূলক রূপ দিতে হলে যে বিপুল ধনভাণ্ডার প্রয়োজন তার জন্য দরকার স্থায়ী তহবিল গঠন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালের ১৩ আগস্ট সঙ্ঘের আর্ত সেবাকার্যের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪২ সালের ১৬ অক্টোবর ঝড়-বন্যার ফলে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং ১৯৪৩-৪৪-এ দুর্ভিক্ষের ফলে উক্ত দু'টি জেলা-সহ অন্যান্য জেলায় যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শুধু খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধপত্রের সমস্যাই হয়নি, অসংখ্য মানুষ গৃহহীণ হয়ে পড়েছিল। এছাড়া অর্থাভাবে বহু ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছিল। শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে তাদের জীবন প্রায় নষ্ট হবার উপক্রম হয়। ভারত সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্যের সঙ্গে পল্লী জীবনের (মূলত মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলা) এই দুর্দশা মোচনের জন্য 'পল্লী সংগঠন' করা হয়েছিল।

মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার ৯ এবং ১০ নং ইউনিয়নে সঙ্ঘ থেকে ৪/৫টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। ছাত্রদের নীতি ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২০০ কুটির তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৪৫-এ বর্ষার প্রারম্ভে আরো ২০০টি কুটির নির্মাণ করা হয়।

পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলায় ১০/১২টি পুষ্করিণী খনন করা হয় ১৯৪৪-এ ডিসেম্বর মাসে। পরবর্তীতে আরো ১০টি পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার করা হয়। এতে ৩০টি গ্রামের ১২ হাজার লোক উপকৃত হয়।

প্রায় ১৫টি বিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়া বহু নিঃস্ব পরিবারকে ধানভাঙা, সুতাকাটা বা কাপড় বোনার জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয়।

১৯৪৪ সালের শেষে এবং ১৯৪৫ সালের প্রথমার্ধে খাদ্যাভাব নিয়ন্ত্রণে আসার এক বছর পর গ্রাম বাংলায় উদ্বেগের কারণ হিসাবে মহামারীর সমস্যা না থাকলেও ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ২০০ গ্রামে এবং কলেরা আক্রান্ত ১৫টি গ্রামে ২০টি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে উপযুক্ত ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক মতে সহস্রাধিক রোগীকে বিনাব্যায়ে চিকিৎসা করা হয়।

বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এবং সে ক্ষেত্রে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ত্রাণকার্য শেষ হতে না হতে ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে (১৩৫২ সনের গ্রীষ্মকাল) বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এক্ষেত্রে ১৩৫২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীকে কেঞ্জাকুড়া ও শালদিয়া কেন্দ্র হতে নিয়মিত ত্রাণসাহায্য দেওয়া হয়। সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে বিভিন্ন মিলন মন্দিরের মাধ্যমে দুঃস্থ নরনারীকে চাল বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক মিলন মন্দিরের সভাপতির নিকট একটি ক্ষুদ্র অর্থ ভাণ্ডার দিয়ে নির্দেশ দিয়ে আসেন যাতে নতুন দুঃস্থদের সাহায্যে দেওয়া হয়, অনশনে মৃত্যু যেন না ঘটে।

এভাবে খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব ও মহামারী প্রপীড়িত বাংলার নরনারীকে রক্ষার জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও আন্তরিকতা সহানুভূতিও ও নিরপেক্ষতার স্পর্শে তাদের দান হয়ে উঠেছিল অসামান্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সহায়তা বা রক্ষার ব্যবস্থা শুধু মানবতা বা দয়া দাক্ষিণ্যের কথা নয়; সমগ্র বাংলার অধিবাসীরই আত্মরক্ষার কথা, বাঁচবার কথা। কারণ শ্রমজীবী সমাজ ধ্বংস হলে বাংলার খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে বাংলার অধিবাসীকেই নির্মমভাবে আঘাত করবে। তবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পঞ্চাশের মন্বন্তরের মতো বিপর্যয়ে অন্ন, বস্ত্র সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধানে সম্পূর্ণ সমর্থ নয়। এর লক্ষ্য দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলি যাতে একেবারে না মারা যায় ত্রাণ সাহায্য দিয়ে শুধু সেটুকুই তত্ত্বাবধান করা। তাই এক সের চাল বিতরণের সময় পুনঃ পুনঃ তাঁরা চিন্তা করেছেন--- কোন লোকটি সর্বাপেক্ষা অভাবগ্রস্ত। একজন সন্ন্যাসী বস্ত্রদানের সময় বিচার করে দেখেছেন— কার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র অস্থি-চর্মসার, বুভুক্ষু নরনারীর করুণামাখা, বিবর্ণ মুখমণ্ডল দিনের পর দিন নিরীক্ষণ করে তারা দুঃখে বেদনায় জ্বলেপুড়ে মরেছেন। তৃষ্ণার্ত শিশুকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি তাদের বক্ষে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করেছে। তাঁরা দেখেছেন— এক চামচ মাত্র জমানো দুধের জন্য দূর দূরান্তর থেকে ঘরের নবীনা বধূটি পর্যন্ত সদ্যোজাত শিশু কোলে করে সেবাকেন্দ্রে ছুটে এসেছে— 'বাবা আমার বাচ্চাকে রক্ষা কর। তোমরা আমাদের ধর্মের বাপ।' দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই, সংকোচ নেই। সারাটা দিন উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বিরাট জনস্রোত অবিশ্রান্ত পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটেছে। প্রাতঃকাল থেকে রাত পর্যন্ত— আবেদন-নিবেদন, কাতোরোক্তি, শেষপর্যন্ত পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠন— শুধু একমুষ্ঠি চাল বা একটি পুরাতন বস্ত্রের জন্য। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ স্বীয় শক্তি দ্বারা যত দূর পেরেছে— অন্ন, বস্ত্র, ওষুধ-পথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি। কিন্তু স্বীয় শক্তি-সামর্থের বাইরে যে সমস্যা ও আবেদন, অন্তরকে বাধ্য হয়ে সেখানে পাষাণ করতে হয়েছে। সেবাব্রতী কর্মীগণের পক্ষে বোধহয় এটাই সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার।

কিন্তু যখন দেখা যায়— 'তেরশো পঞ্চাশ' কেবল ইতিহাসের একটি সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটি দেশের শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, অক্ষমতার ইতিহাস। তখন যাঁরা প্রকৃত মানুষের মতো আর্ত মানুষের সেবায় ও সামাজিক দায়িত্ববোধে নিয়োজিত তখন তাদের জনপ্রিয়তা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়; জনমানসে তারা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে।

এছাড়া বিশেষ রাজনৈতিক চরিত্রের অধিকারী না হয়েও এদের কার্যাবলী জাতীয় আন্দোলনকে অনেকটাই সফল করেছিল এবং এই কার্যাবলী দেশবাসীর হিতসাধক সজীব সত্তা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁরা আমাদের অভিনন্দনীয়। ∎

শতবর্ষের আলোয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতসেবাশ্রম সংজ্ঞকং যঃ
প্রতিষ্ঠাপ্য সঙ্ঘং জগদুদ্দিধীর্ষুঃ।
লেভে চ কীর্তিং যুগাচার্যসংজ্ঞাং
তং নৌমি সাক্ষাৎ শিববিগ্রহং পরম্।।

যুগপ্রয়োজনে এবং মহাকালের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ভগবান বুদ্ধ স্থাপনা করেছিলেন বৌদ্ধ সঙ্ঘ। তেমনি সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় এবং কালের প্রয়োজনে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ প্রবর্তন করলেন আর এক সঙ্ঘের যার নাম হলো ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের ইতিহাসে সংযোজিত হলো এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯১৭ সালের মাঘী পূর্ণিমার এক পুণ্য লগ্নে এই সঙ্ঘের আর্বিভাব যা ২০১৬ সালে শতবার্ষিকী পালন করতে চলেছে।

১৯১৭ সালের মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীর গভীর রাত্রে আচার্য প্রণবানন্দ গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে তন্ময় হয়ে তপঃকুঞ্জের নিভৃত বৃক্ষতলে সমাহিত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করে আকাশবাণী ধ্বনিত হলো--- 'আর বিলম্ব কেন? সুসময় উপস্থিত। কঠোর তপঃসাধনায় যে মহাজ্ঞান, যে মহাশক্তি লাভ হইয়াছে সেই মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি সমগ্র জাতির মুক্তি আনয়নে সমর্থ। আগামী মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যদিনে সঙ্ঘ-যন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া যুগ ধর্মের মৃতসঞ্জীবনী বাণী প্রচার কর'। এই মহাবাণী আচার্য প্রণবানন্দের হৃদয়ে মহাভাবের এক সুগভীর তরঙ্গ সৃষ্টি করল। সারারাত তিনি এক চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইলেন। পরদিন প্রাতে অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে আহ্বান করে বললেন, আগামী মাঘী-পূর্ণিমার দিনে এই তপঃকুঞ্জে পূজা-উৎসব করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রথমদিকে অনেকেই একটু দ্বিধায় ছিলেন। আশ্রম বলতে তখনকার সময় বোঝাত প্রাচীনকালের সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রম। বর্তমানে কলিযুগে সেই প্রাচীনকালের মতো আশ্রম স্থাপন কীভাবে সম্ভব সেই চিন্তা-ভাবনা নিতান্ত অবাস্তব মনে হতে লাগল। কিন্তু, স্বামী প্রণবানন্দজী সকলের মনেপ্রাণে এক অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটালেন। অবশেষে মাঘী-পূর্ণিমার পুণ্যতিথি উপস্থিত হলো। 'অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শেষ রাত্রে আসিয়া তপঃকুঞ্জে সমবেত হলেন। আচার্যদেব তাহাদের নিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। তৎপর দেবী বনদুর্গার আসনবৃক্ষের নিকট অহোরাত্র নামকীর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া, 'রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন রাম-নারায়ণ হরে' নাম আরম্ভ হইল। আচার্যদেব নিজেই প্রথম কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন, অন্যান্য সকলে পিছনে তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত্রি পালা করিয়া কীর্তন চলিল।'

বিকাল চারটের সময় স্থানীয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। গোহালা থেকে আগত সুপণ্ডিত ও সুবক্তা রঘুনন্দন গোস্বামী প্রায় এক ঘণ্টা ভাষণ দিয়ে আচার্য প্রণবানন্দজীর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে সবাইকে তাঁকে সহযোগিতা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। এইভাবে শুভসূচনা হলো আজকের ভারত তথা ভুবন-বিখ্যাত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের। এরপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সেই একই মাঘী পূর্ণিমার দিন স্বামী প্রণবানন্দজীর নেতৃত্বে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নাম নির্বাচনের প্রসঙ্গে যুগাচার্য বলেছিলেন, 'আমি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চাই; সুতরাং নামের মধ্যে সঙ্ঘ-শক্তিসূচক শব্দ থাকা চাই। সমগ্র ভারত এই সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্র, ভারতীয় জাতীয়তার পুনর্গঠন--- এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য; সুতরাং, 'ভারত' কথাটি রাখা আবশ্যক। সনাতন বৈদিক আদর্শ হবে--- এই সঙ্ঘের ভিত্তি। সুতরাং 'আশ্রম' শব্দটিও বাদ দেওয়া চলবে না। জাতি-সমাজ-ব্যক্তির সর্ববিধ সেবাই সঙ্ঘের কার্য; সুতরাং 'সেবা' কথাটিও থাকবে।'

রামকৃষ্ণ মিশনের মতো বিভিন্ন সঙ্ঘ-আশ্রমের যেমন নিজস্ব সিলমোহর আছে তদনুরূপ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘেরও নিজস্ব সিলমোহর আছে, যার মাঝে নিহিত আছে সঙ্ঘের ভাবধারা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

শীলমোহরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে তারকা চিহ্নের মাঝে রয়েছে ওঁ-কার বা প্রণব। সেই সঙ্গে রয়েছে তির-সংযোজিত

ধনুক। ওঁ-কার পরব্রহ্মের প্রতীক, তির-ধনুক লক্ষ্যভেদের প্রতীক আর জীবাত্মা বা মন হলো সেই তির। শিকারি যেমন লক্ষ্যভেদ করার জন্য একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যবস্তুতে পূর্ণ-মনসংযোগ করে ঠিক তেমনই সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে, শ্রীগুরুর আদেশ নির্দেশ প্রতিপালনের দ্বারা একাগ্রচিত্তে পূর্ণ মনসংযোগ করে পরব্রহ্মকে লাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এছাড়াও চার কোণে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। শঙ্খ— নিষ্কাম কর্মযোগের প্রতীক। ফলাকাঙ্ক্ষা না করে মানব-কল্যাণের লক্ষ্যে কর্ম করা। চক্র— ষট্‌চক্র। যোগসাধনার প্রতীক। চিত্তকে ভোগ্যবিষয় থেকে সরিয়ে পরব্রহ্মের সহিত যুক্ত রাখা। গদা— মোহমুদ্গর। নিজেকে মোহ থেকে মুক্ত করা। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। পদ্ম— ভক্তির প্রতীক। শ্রীগুরুর প্রতি অচল-অটল ভক্তি নিবেদন।

একটি পত্রে সঙ্ঘনেতা লিখলেন, ‘নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব হইয়া পরিত্রাণ কর— পতিতকে। রক্ষা কর— বিপন্নকে। শান্তি-সুখ দাও সন্তপ্তকে। আশ্রয় দাও— নিরাশ্রয়কে। এমন দিন তোমাদের সঙ্ঘের শীঘ্রই আসিতেছে, যখন সহস্র সহস্র লোক এই সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসিয়া জীবন-জনমের উদ্দেশ্যলাভে সফল মনোরথ হইবে।’

প্রকৃতির তাণ্ডব এবং রুদ্ররোষে মানুষের শান্তির জীবন ছারখার হয়ে যায়। অসহায় মানুষ যখন সামান্য সাহায্য সহায়তার আশায় উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষা করে সেই সময় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দ সেবার বরাভয় হস্ত প্রসারিত করে দুর্গত, বিপদগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

১৯২১ সালে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা এবং সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের সেবাকার্য সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়াও ‘উত্তরবঙ্গ বন্যা’, ‘ওড়িশা বন্যা ও দুর্ভিক্ষ’, ‘মেদিনীপুর বন্যা’, ‘পাবনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা’ প্রভৃতি দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য দেশের বরেণ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারত সেবাশ্রমের কার্যাবলী দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে এই সঙ্ঘের আশ্রয় লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। এছাড়াও দেশবন্ধু

With Best Compliments from-

A

Well Wisher

বালীগঞ্জ স্টেশনচত্বর পরিষ্কার করছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা।

চিত্তরঞ্জন দাশ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একজন গুণমুগ্ধ ছিলেন।

এই সঙ্ঘের কর্মী-সন্ন্যাসীগণ কিরূপ দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেবাযজ্ঞে অংশ নিতেন তার একটা ছোট্ট উদাহরণ— 'সুন্দরবনের গ্রামে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমিরের দেশে', কামোঠ যেখানে কিলবিল করে--- সেখানে কর্মীগণ নৌকার অভাবে জল সাঁতরাইয়া খালবিল পার হইয়া ছুটিত। জলের অভাবে পচা, দুর্গন্ধ জীবাণুদূষিত জল পান করিতে বাধ্য হইত। ভীষণ ঝড়বাদলের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গসমাকুল বিক্ষুব্ধ নদীবক্ষে চাউল বোঝাই নৌকা দুঃসাহসে চালাইয়া যাইত। অনাহারে সমস্ত দিবস গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন ও তালিকা সংগ্রহপূর্বক রাত্রিতে কাঁচাকলা সিদ্ধ ভাত রাঁধিয়া উদর পূরণ করিত; কিছু না জুটিলে অনাহারেই থাকিত।' যে সেবাযজ্ঞের বীজ অধুনা বাংলাদেশের পুণ্যভূমি বাজিতপুরে রোপিত হয়েছিল তা আজ মহীরুহে পরিণত হয়ে শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। কিন্তু বার্ধক্য তাকে স্থবির করতে পারেনি, যৌবনদীপ্ত তেজের সঙ্গে তার শিকড় আজ ছড়িয়ে পড়ছে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে। তার সেবা-যজ্ঞ ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির শাখাপ্রশাখা তারুণ্যের দীপ্তি নিয়ে ক্রমশই প্রসারিত হয়ে চলেছে। একদিকে যেমন ভারতীয় সনাতন ধর্মের গৈরিক বৈজয়ন্তীকে তারা ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানবাত্মার সেবায় নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিচ্ছে। তাই আজ দেশের সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় এই সেবাশ্রম সঙ্ঘ অভিসিঞ্চিত। জনসেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রতি পুরস্কৃত করেছে।

আকাশে সূর্যের বহু বর্ণের রশ্মিচ্ছটা যেমন মানুষের প্রাণ-প্রবাহকে সঞ্জীবিত রাখে তেমনি সঙ্ঘের কর্মযোজনাগুলি যথা— (১) ধর্মপ্রচার, (২) তীর্থ-সংস্কার, (৩) শিক্ষাবিস্তার, (৪) জনসেবা, (৫) হিন্দু-মিলন মন্দির স্থাপন, (৬) হিন্দু-রক্ষীদল গঠন, (৭) অনুন্নতোন্নয়ন, (৮) অস্পৃশ্যতা নিবারণ, (৯) আদিবাসী কল্যাণ, (১০) ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে উপকৃত করে চলেছে।

সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর স্থূল দেহ ত্যাগের পর সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁরই হাতে তৈরি সুযোগ্য শিষ্য স্বামী সচ্চিদানন্দ। তাঁর অপ্রকটের পর এই দায়িত্বভার অর্পিত হয় স্বামী যোগানন্দের উপর। এরপর স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী অক্ষয়ানন্দ, স্বামী ত্রিদিবানন্দের পর বর্তমান সঙ্ঘ সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দের সুযোগ্য অধিনায়কত্বে সঙ্ঘের কার্যক্রম সুচারুভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় ও গুরু মহারাজ আচার্যদেবের অদম্য কর্মশক্তির প্রেরণায় যে সঙ্ঘের মহাপ্রকাশ হয়েছিল তা অনাগত আরও বহুযুগ ধরে ধর্মযজ্ঞ ও কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করে চলবে।

তথ্যসূত্র :

(১) আবির্ভাব শতাব্দীর অর্ঘ্য--- শতবার্ষিক্যাং প্রণামাঞ্জলি--- ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়।

(২) শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য জীবনচরিত— স্বামী বেদানন্দ।

(৩) শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য সঙ্গ ও উপদেশামৃত— স্বামী আত্মানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

তথ্য সহায়তা :

শ্রদ্ধেয় ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

সেবাকাজে সন্ন্যাসীরা।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

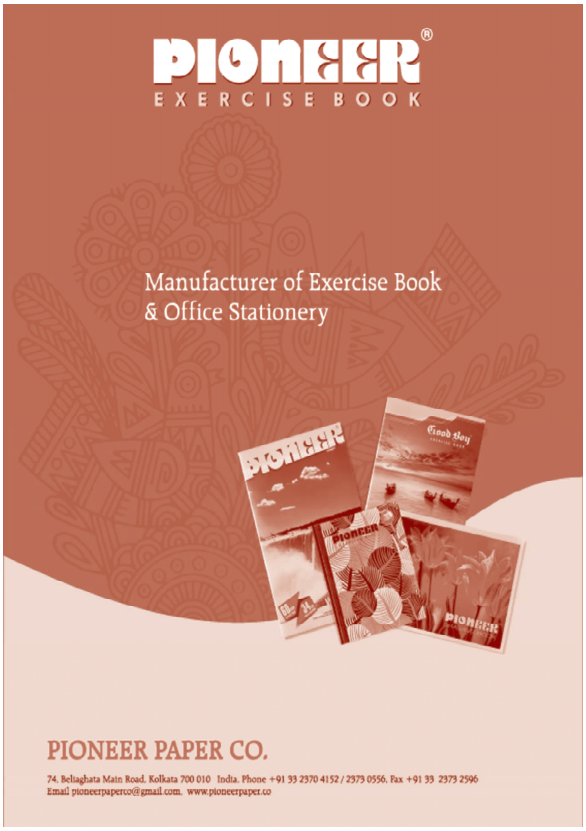

'বস্তুত অপরের দ্বারা কেউ শিক্ষিত হয় না। নিজেকে নিজে শিক্ষাদানই শ্রেষ্ঠ অধ্যাপনা। প্রকৃত শিক্ষা হল নিজে নিজে শেখা। আদর্শ সম্বন্ধে নিজ অনুভব, উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিজের তীব্র উদ্যম, এসব সহায়েই আমরা যথার্থ উন্নত হই, অপর কোন উপায় দ্বারা নয়। আদর্শ আমাদের কাছে কিরূপে প্রতিভাত তাতে কিছু যায় আসে না, লক্ষ্যের উর্ধগামী পথ কঠিন কি সহজ তাতেও একেবারেই কিছু আসে যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, এটি আমাদের নিজেদের সংগ্রাম— এরই সহায়ে আমরা উন্নত হই।'

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

অতিথি কলম

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিনই যুক্তি তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ ছিল না

স্বপন দাশগুপ্ত

সেই ১৯৩৩ সালে তৎকালীন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে একটি মত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতৈক্যে মান্যতা পেয়েছিল। সেটি হলো— 'This house would not in any circumstances fight for king & Country', তার অর্থ এই সংগঠন কখনই রাজা ও দেশের মতামতের স্বপক্ষে লড়াই করবে না। সাম্প্রতিক জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে যে বাদানুবাদ ও নানান বিতর্কিত কাণ্ড ঘটে চলেছে ও তারই প্রতিক্রিয়ায় পক্ষে-বিপক্ষে যে তিক্ত, বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই বিষয়টিকেই কিছুটা হালকা করে দেখাতে জনৈক প্রবীণ সমাজ বিশ্লেষকের এই মন্তব্য বাজারে এসেছে। আদি মতটির সারাংশ ছিল এমন যে— ''বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সদাই চালু ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের কাজই সচরাচর প্রচলিত বা গৃহীত রীতিনীতির উল্টো পথে চলা। তাই এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বেশি মাথা না ঘামানো উচিত।''

এখন স্বরাষ্ট্রদপ্তর একজন বিছিন্নতাবাদীদের সমর্থনকারী উত্তেজক বক্তৃতা দেওয়া ছাত্রনেতাকে দেশদ্রোহিতার দায়ে গ্রেপ্তার করে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করেছে কি না তা নিয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকতেই পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যারা খোলাখুলি দেশবিরোধী জিগির তুলছে এমন একটি সভায় একটি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি হিসেবে মজুত থাকা কী অর্থ বহন করে সেটিও বিতর্কের রসদে ভরপুর।

এখন ১৯৩৩ সালে গৃহীত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দেওয়া সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে প্রয়াত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রবিদ উইনস্টন চার্চিল কী বলেছিলেন সেটাও দেখা যাক। ছাত্রদের এই মহান অভিমতকে চার্চিল কিছু চোখা বিশ্লেষণে এফোঁড় ওফোঁড় করে বলেন— 'abject, squalid, shameless & nauseating —আভিধানিক বাংলায়' জঘন্য, অতি নোংরা, নির্লজ্জ ও বমন উদ্রেককারী। এখন আর পাঁচজন গড়পড়তা দেশবাসী যাদের পাণ্ডিত্যের ওজন জে এন ইউ-এর এমন উগ্র মত পোষণকারী সহমর্মীদের মতো অত গুরুভার নয়, তারা সকলেই সাম্প্রতিক কাণ্ডকারখানা দেখে চার্চিলের মতটিকেই অভ্রান্ত পর্যবেক্ষণ বলে মনে করছেন। বস্তুতপক্ষে বৃটিশ সমাজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই মতের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় তুমুল বিরোধী প্রতিক্রিয়া শুধু দেয়নি, তারা উচ্চকণ্ঠে বলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিপথগামী, নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাত্রদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

ঠিক তেমনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপদ আশ্রয়ের বদলে যদি ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার মতো স্লোগান রাস্তায় উঠত বা দেশ আক্রমণকারীর ফাঁসিকে অন্যায়-অবিচার বলার মতো ধৃষ্টতা দিল্লী প্রেস ক্লাবের বাইরে জনসমুদ্রের মাঝে দেখানো হোত সেক্ষেত্রে কী ঘটত সেটা ভাবলেও আতঙ্কিত হয়ে পড়তে হয়। ক্যাম্পাসের ছত্রছায়া কি এই কাজে ব্যবহারের জন্য? ঠিক এই রকম টাউন-গাউন বিভাজন (নির্বাচিত বিশেষ মতের এলিট ও আম-জনতা) নজরে পড়ে যখন একজন বিতর্কিত পড়ুয়ার ওপর 'দেশবিরোধী' ধারায় মকদ্দমা রুজু হয়। অবশ্যই এই পর্বে কিছু আইনজীবীর ন্যক্কারজনক ব্যবহার আদৌ ক্ষমাযোগ্য নয়। কিন্তু গোটা কর্মকাণ্ডটিকে এই মওকায় একটা ভিন্ন পথে চালিত করার প্রবণতা নজরে পড়ছে। কংগ্রেস থেকে শুরু করে মাওবাদী অবধি সকলেই বিষয়টিকে নিয়ে ফ্যাসিবাদের ধুঁয়ো তুলে দেওয়ার চেষ্টার কসুর করছে না। এরই সুযোগ নিয়ে সরকারের ওপর আক্রমণ শানাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কিছু নিজ মতবাদ প্রচারকারীরা সহমর্মিতার মোড়কে ভারতবাসী তার উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে কী করবে না করবে তার সিলেবাস নানান প্যামফ্লেট, পোস্টারের আকারে বিতরণ শুরু করে দিয়েছে।

এই সমস্যাটা তৈরি করার জন্য দায়ী ভারতের বাম ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের একে অন্যের ওপর তীব্র ব্যঙ্গাত্মক চর্চা, যাকে এক শ্রেণীর সাংবাদিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে প্রায় গৃহযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে এক পায়ে খাড়া। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানান সংবাদ, তথ্য ও চিন্তার পারস্পরিক বিনিময় হওয়া ও সুস্থ বিতর্কসভা চলাই অভিপ্রেত।

আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়কে তার পরিসরের বাইরে এনে সেই মত বিনিময়ের বিষয়বস্তু যখন বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের পরস্পর বিরোধিতাকে কমাতে না পেরে তাকে বাড়িয়ে তুলছে সেখানে আবার চরম শত্রুতার ঘটনা ঘটে চলেছে। সামাজিক ধ্যান ধারণার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে টিভি চ্যানেলের বিতর্কগুলিতেও ওই এলিটিস্ট সংখ্যাগরিষ্ঠরা অন্য মতকে দমিয়ে দিতে চাইছে। এক ঘরে করে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে ভিন্নমতাবলম্বী বিচ্ছিন্নতাবাদী-বিরোধী সাংবাদিকদের। টাটকা উদাহরণ অর্ণব গোস্বামী।

এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের দায় বা সমাজে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা মোদী সরকারের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একেবারেই একটি কপট উদ্দেশ্যবহনকারী, যে বিশ্বাস আবহমানকাল ধরে জারিত ও বাহিত হয়ে আমাদের বিশ্বাসের অন্তস্থলে পৌঁছে প্রায়

স্থানুবৎ হয়ে যায় বা চিন্তাস্তরে গেঁথে যায় তাকেই বলা হয় মাইথোলজি, যা থেকে মিথ কথাটি খুবই প্রচলিত হয়েছে। এই মিথেরই একটি তুলনামূলক আধুনিক নমুনা হচ্ছে জে এন ইউ। যেটি মুক্তচিন্তা, নানান বিরুদ্ধ মতের বিনিময়, খোলামেলা অভিমতের দেওয়া-নেওয়ার পীঠস্থান বলে সমাজে এক কথায় পরিচিত। এটি একটি সম্পূর্ণ অসত্য প্রচার।

চালু হওয়ার প্রথম থেকেই এখানে সর্বদাই একটি পূর্বনির্ধারিত দৃষ্টিকোণ এবং নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল কোন কোন বিষয়ই শুধু চর্চিত হওয়ার অধিকার পাবে আর অন্য যা কিছু হবে বর্জনীয়। থাকত এক গণ্ডী যা লক্ষ্মণরেখা বললেই সঠিক বলা হবে।

রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে এই তথাকথিত মুক্ত চিন্তা বলতে বোঝানো হোত ৫৭ কিসিমের মার্কসবাদী দল-উপদলের অন্তর্দলীয় বিতর্ক। সঙ্গে থাকত নেহরু ও লোহিয়া ঘরানার রাজনৈতিক মতবাদ ও অতি সম্প্রতি এ তাবত হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে কিছু কিছু বিধানসভায় ক্ষমতায় থাকা বা কিছু আসন পাওয়া রাজ্য থেকেও বিচ্যুত 'অনাথ' বামপন্থী দলগুলির তথাকথিত অল্টারনেটিভ বা বিকল্প রাজনৈতিক মতবাদের নিষ্ফলা চাষ-আবাদকে। অতি সম্প্রতি আবার পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এই বামপন্থার দৈন্যতার কারণে রক্তক্ষরণের দুঃখ মোচন করতে বিকল্প হিসেবে সহমর্মী জে এন ইউ -এর মৌলবাদী গোষ্ঠী ইসলামকে আশ্রয় করেও বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু কায়মনোবাক্যে যে অলিখিত ফতোয়াটি অপরিবর্তনীয় ভাবে জারি রয়েছে তা ভারতের চিরকালীন মর্যাদাময় কিছুটা রক্ষণশীল সংস্কৃতি ও তার সাম্প্রতিক সময়ের সঙ্গে তাল মেলানো বিবর্তিত রূপ সম্পর্কে তীব্র অনীহা ও ভারতীয় পরম্পরাকে চিরপরিত্যক্ত করে রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

এই ভিন্ন মতকে আলিঙ্গনের বদলে অচ্ছুত করে রাখার পরম্পরা যে কতটা শিকড় গেড়ে রয়েছে তা প্রকাশ পেয়েছে এখানেরই প্রাক্তনী অধ্যাপক পিটার ডি সুজার সাম্প্রতিক প্রকাশিত নিবন্ধে। জে এন ইউ-এর দিক দর্শনকে বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন— 'উদারবাদী চিন্তনকে পরিসর দেওয়ার প্রচেষ্টা সর্বদাই স্টালিনবাদী বামপন্থীদের চেষ্টায় রুখে দেওয়া হয়েছে। অন্য ভাবনার দিশারিরা নিজেদের প্রকাশের স্বাধীনতা পায়নি। রাজনৈতিক পটভূমি বড় হলেও সেটিকে বৃহত্তর করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। বিশ্লেষণমূলক চিন্তা এখানে অত্যন্ত দুর্বল আর নির্দিষ্ট আদর্শের ধারক বাহকরা এই তুলনামূলক অযোগ্যদেরই টিকিয়ে রাখছে'। জে এন ইউ তাদের ভাবধারাকে দীর্ঘদিন ধরে লালন করছে এবং বহুবার তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেননা সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছে যে এখানকার ছাত্রদের বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান দেওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এটাই তো দস্তুর— এর অগ্রপশ্চাৎ অভিঘাত বিচার করাও অপ্রয়োজনীয়।

হঠাৎ এক পড়ুয়ার ওপর দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এসে যাওয়ায় আদতে তারা একটা পালিয়ে যাওয়ার (escape route) রাস্তাই বরং পেয়ে গেছে। যেখানে অতীত নিয়ে অপ্রীতিকর প্রশ্নগুলি বিশেষ করে জে এন ইউ-এর ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় জাতিসত্তার সম্পর্কটি আসলে কীরকম ছিল বা আছে সেই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাটি ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য করতে হবে, ২০১৫ সালের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরই জে এন ইউ-সংরক্ষিত বিশেষ আদর্শগত ধারণার বুদবুদটি ফেটে যায়। নতুন সরকারের কর্মকাণ্ডে ও তার বিভিন্ন ক্ষমতার অলিন্দে তাদের অধিষ্ঠান করা ও নাক গলানো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা যথেষ্ট নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে গুরুত্বহীনতার অবসাদেও আক্রান্ত। এরই ফলশ্রুতিতে মরিয়া হয়ে তারা এই সরকারকে মানসিক বা মেধাগতভাবে প্রতিবন্ধী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। তারা এই সরকারের পরিচালকদের অর্ধশিক্ষিত, নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বোধহীন এমনকী মানসিক বিকলাঙ্গের তকমা দিতেও দ্বিধা করছে না। ঠিক এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হলো পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত উত্তর আধুনিকতাবাদের বামপন্থী আখড়ায় (Ghetto)।

আমার মনে হয়, 'দেশদ্রোহিতা' নিয়ে এই হট্টগোল একসময় থিতিয়ে আসবে কিন্তু তথাকথিত ভারতীয় বিদ্বজ্জনদের এই বৈষম্যমূলক ও একটি নিজ-নির্দিষ্ট ভাবধারাকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্যকে তাচ্ছিল্য করার বিষয়টি দীর্ঘ চর্চার দাবি রাখে। কেননা ভারত বলতে কি শুধুই কিছু পর্বত, নদী, উপত্যকা নিয়ে গঠিত একটি ভৌগোলিক অঞ্চল সূচিত হয়, নাকি তা এক পবিত্র প্রাচীন পরম্পরাকেও বোঝায়? এ নিয়ে বিতর্ক এক দীর্ঘতর চিন্তা-মেরুকরণেরও রসদ যোগাবে।

রায় ব্রাদার্স

(দশকর্মা ভাণ্ডার)

প্রো :- রামকৃষ্ণ রায়

(ব্রজসুন্দর গোপাল ও বাজাজ শো-রুম-এর মাঝখানে)

জে এল ব্যানার্জী রোড, মহাজনপট্টি মোড়

রামপুরহাট, বীরভূম

ফোন : (০৩৪৬১) ২৫৫৪৫২ / ৯৪৩৩৫৩০৮৮০

৯৪৭৪০০৯১০৫ / ৮৯২৬২৮০৪০১

কেরলে আশায় বুক-বাঁধছে বিজেপি

কুম্মানাম রাজশেখরনের বিমোচন যাত্রায় বিপুল সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেস-সিপিএমের আঁতাতকে যে ভারতবর্ষের মানুষ খুব সুনজরে দেখছেন না তার সাক্ষী হয়ে রইল কেরলের বিজেপি সভাপতি কুম্মানাম রাজশেখরনের বিমোচন যাত্রা। একই সঙ্গে এই যাত্রা কেরলের রাজনীতিতে নতুন রাজনৈতিক শক্তি উত্থানেরও ইঙ্গিত দিয়ে রাখলো। কেরলের ১৪০টি বিধানসভা এলাকা জুড়ে এই যাত্রা আয়োজিত হয়েছে। মূল দাবি ছিল খাদ্য, মাটি, জল, কর্মসংস্থান ও সকলের জন্য সমানাধিকার। যাত্রাপথে ১৩টি স্থানে নয়া বিজেপি সভাপতি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রেই উপচে পড়েছে ভিড়। বহু জায়গায় অন্য পার্টির সদস্যরা বিজেপি-তে যোগদানও করেছেন। কেরলের রাজনীতি বরাবরই নিয়ন্ত্রিত হয় বাম মদতপুষ্ট লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এল ডি এফ) এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউ ডি এফ)-এর মাধ্যমে। সেখানে বিজেপি-র প্রতি সাধারণ মানুষের এই অভূতপূর্ব জোয়ারের পেছনে তথ্যাভিজ্ঞ মহল প্রধানত দু'টি কারণকেই ধরেছেন।

প্রথমত, রাজ্য বিজিপি-র সভাপতি কুম্মানাম রাজশেখরনের বিপুল জনপ্রিয়তা। এবং দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক দেশ-বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপে কংগ্রেস-বামপন্থীদের সক্রিয় আঁতাত দেশের মানুষ মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে জোট-রাজনীতির স্বার্থে এই দুই দল যেভাবে একসঙ্গে মিলছে তার প্রভাব কেরলে দু'দলের পার্টি কর্মীদের ওপরও পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তাই কেরল রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ভি এস সুধীরন এবং সিপিএম সুপ্রিমো পিনারাই বিজয়নের সভামঞ্চ যখন মাছি তাড়াচ্ছে, কুম্মানাম রাজশেখরনের সভায় তখন উপচে পড়া ভিড়। সম্প্রদায়গত বিবাদের জন্য যে কেরল এতদিন এক হতে পারেনি, তারাই হঠাৎ কোনো মন্ত্রবলে একসূত্রে বাঁধা হয়ে গেল। কুম্মানাম তাঁর যাত্রাপথে কোনো বাদ বিচার না করে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। তাঁদেরকে নিছক নিজের সম্প্রদায়ের মানুষ বলে না মনে করে, ভারতবাসী হিসেবে ভাবতে অনুরোধ করছেন। আর এতেই সাধারণ কেরলবাসী মুসলমানদের 'প্রেম জেহাদ' এবং খৃষ্টানদের 'ধর্মান্তরকরণে'র বিরুদ্ধে যুঝতে সাহস পাচ্ছেন।

কুম্মানাম ইতিপূর্বে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সংগঠন সম্পাদক, হিন্দু ঐক্য বেদীর সাধারণ সম্পাদক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বহু মানুষ জানিয়েছেন তাঁরা এতদিন এমন মানুষেরই অপেক্ষায় ছিলেন। এই মানুষরা সেই সমাজের প্রতিনিধি যাঁরা রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করেন, ট্রামে-বাসে যাতায়াত করেন, রেলের প্ল্যাটফর্মে কাগজ-বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এই কুম্মানাম রাজশেখরন হলেন সেই মানুষ যিনি এদেরই সহযাত্রী হতে পারেন, এদের সঙ্গেই প্ল্যাটফর্মে রাত কাটিয়ে দিতে পারেন। যাঁর জীবনের অনেকগুলি দিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোচির পুরনো কার্যালয়ের ঘুপচি ঘরে কেটেছে। ইনি হলেন সেই মানুষ যিনি যুবক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী, গ্রামীণ-শহরে, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলতে পারেন। এঁর নেতৃত্বাধীন বিজেপি এখন কেরলবাসীর বড়ো ভরসার জায়গা।

নিজেরে স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের দাবি

ফসলের লাভজনক মূল্য দিতে হবে কৃষকদের

সংবাদদাতা ॥ ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় অধিবেশন রাজস্থানের জয়পুরে গত ১৯ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল। অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত কৃষিমেলার উদ্বোধন করেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী আনন্দীবেন প্যাটেল। মূল অধিবেশনের উদ্বোধন করেন যোগগুরু বাবা রামদেব। স্থানীয় এম পি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন রাঠোর ছিলেন বিশেষ অতিথি। প্রায় ৬৫০০ জন ব্লকস্তরের প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিলেন ১৮৬ জন প্রতিনিধি। এদের মধ্যে ৪২ জন মহিলা। তিনটি প্রস্তাব এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি হলো— কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য দিতে হবে, রাসায়নিক সার তৈরির জন্য বিদেশি কোম্পানিগুলিকে যে টাকা দেওয়া হয় তার পরিবর্তে সেই অর্থ কৃষকদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হোক এবং সারা ভারতবর্ষে সরকার জৈবিক চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এই অধিবেশনে কিষাণ সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে কর্ণাটকের বাসুদেব গৌড়া এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জয়পুরের বদ্রীনারায়ণ চৌধুরী নির্বাচিত হন।

উবাচ

“সংগঠন তৈরির স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতার হাত ধরেই শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। আমরা ভুলে যাচ্ছি, সমস্ত স্বাধীনতারই একটা সীমা রয়েছে।”

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে।

“তারা (আমেরিকা) কি ক্যাম্পাসে ওসামা-বার্ষিকী পালন করতে দেবে?”

বেঙ্কাইয়া নাইডু
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

আমেরিকার রাষ্ট্রদূত রিচার্ড ভার্মার বাক্‌স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

“জীবনে যতই উন্নতি কর না কেন, যতই গবেষণা হোক, দেশকে কিন্তু ভুলো না। তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমের প্রবণতা কমে গিয়েছে।”

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
মন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ২৩তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

“ইসলামিক স্টেট নামের জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে এই লড়াই খুবই কঠিন। তবে আই এস-কে খতম করবে আমেরিকাই।”

বারাক ওবামা
প্রেসিডেন্ট, ইউএসএ

“মিথ্যার ব্যবহার-সহ সব কিছুই দেশের মানুষকে বিপথে চালিত ও সংসদের সময় নষ্ট করার জন্য করা হচ্ছে। এটা কংগ্রেসের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।”

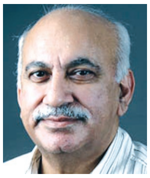

এম জে আকবর
বিজেপির মুখপাত্র

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান প্রসঙ্গে।

রোমারাও ভারতীয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ হাজার বছর আগে ইসলামের তরবারি থেকে বাঁচতে কোটি কোটি হিন্দু ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে রোমা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে। এই রোমা সম্প্রদায়কে আবার তাদের পূর্বপুরুষের দেশ ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করাতে দিল্লীতে গত ১২-১৪ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক রোমা সম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক উৎসব-২০১৬ আয়োজিত হয়। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্ এবং ভারতের অন্তর্রাষ্ট্রীয় সহযোগ পরিষদ। সম্মেলনে ১২টি দেশ থেকে ৩৩ জন স্কলার, ১২ জন শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। ভারতের ১৫ জন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ৩০টি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২০ মিলিয়ন অভিবাসীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের প্রামাণিক তথ্য পরিবেশনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

তিনি জানান, 'রোমা প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি খুবই আনন্দিত। আপনারা যারা অন্য দেশে চলে গিয়ে বসবাস করছেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশের প্রতিকূল পরিবেশে রয়েছেন, তারা সবাই ভারতের সন্তান। বড়ো কথা হলো, আপনারা আপনাদের ভারতীয় পরিচিত বজায় রেখেছেন। ভারতের আমরা সবাই আপনাদের জন্য গর্বিত। আপনাদের 'মূলভূমি' (রোমা ভাষায় বড়ো থান) ভারত আপনাদের আবারও একবার উন্মুক্ত হৃদয়ে স্বাগত জানাচ্ছে।' বিদ্বজ্জনদের ধারণা, ২০ মিলিয়ন রোমা সম্প্রদায়ের মানুষ বলকান-দেশসমূহে বসবাস করেন। রোমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় ১২ শতাংশ, তুর্কিতে ২.৫ মিলিয়ন রোমা বসবাস করেন। এছাড়াও আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, পশ্চিম এশিয়া, স্পেন এবং ফ্রান্সেও এদের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য। রোমারা হলেন ভারতের চৌহান, গুজ্জর, বানজারা সম্প্রদায়ের উত্তরসূরী।

১৯৯০ সালে ভাষাতে প্রমাণ্য এবং জিনগত তথ্য এদের ভারতীয়ত্বের প্রমাণ স্পষ্ট করে দেয়। ওয়ার্ল্ড রোমা অর্গানাইজেশন রোমানিপেন-এর সভাপতি জোভাল দামজানোভিক বলেন, 'আমরা রোমারা একই ভারতীয় শব্দ ব্যবহার করি। আমরা আশা করি ভারত আমাদের 'দূরে থাকা ভাই' হিসাবে গ্রহণ করুক। আই সি সি আর সভাপতি ড. লোকেশ চন্দ্র এদের শিল্পী সম্প্রদায় হিসাবে অভিহিত করে বললেন, এঁরা ছিল তাম্রকার, কামার। যারা পঞ্চদশ শতকে অস্ত্র তৈরি করতেন। প্রচলিত বিশ্বাস যে এঁরা ভারত আক্রমণকারী আলেকজান্ডারের সঙ্গে পঞ্চম শতকে ইউরোপে চলে যান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এঁদের একটা বড় অংশ তুর্কি, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, রাশিয়া ও আমেরিকায় রয়ে গেছেন।

এই সম্প্রদায় থেকেই বিশ্ব পেয়েছে একের পর এক প্রতিভাধরদের। যেমন— পাবলো পিকাসো, স্যার চার্লি চ্যাপলিন, গায়ক এলভিস প্রেসলে, অস্কার বিজয়ী অভিনেতা স্যার মাইকেল কেইন প্রমুখ।

With Best Compliments From

A Well Wisher

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

A
Well Wisher

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA 50g TURMERIC POWDER
DUTA CUMIN POWDER 50g
DUTA 50g TURMERIC POWDER
DUTA CORIANDER POWDER 50g
DUTA RED CHILLI POWDER 50g
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
7 March - 2016 - Rs. 10.00